আলিপুরদুয়ার জেলার লুপ্তপ্রায় রাভা সমাজ ও সংস্কৃতি
একটি সমীক্ষা

এম.ফিল (তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ) উপাধির জন্য প্রদত্ত গবেষণা অভিসন্দর্ভ

গবেষক: ধনেশ্বর বর্মন

রেজিস্ট্রেশন নম্বর: 133489 of 2015-2016

পরীক্ষার ক্রমিক সংখ্যা: MPCO194016

ক্রমিক সংখ্যা: 001700203016

শিক্ষাবর্ষ: 2017-2019

তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা: ৭০০০৩২

মে ২০১৯

Certified that the thesis entitled, **"আলিপুরদুয়ার জেলার লুপ্তপ্রায় রাভা সমাজ ও সংস্কৃতি একটি সমীক্ষা"**, submitted by me towards the partial fulfilment of the degree of Master of Philosophy (Arts) in Comparative Literature of Jadavpur University, is based upon my own original work and there is no plagiarism. This is also to certify that the work has not been submitted by me in part or in whole for the award of any other degree/diploma of the same Institution where the work is being carried out, or to any other Institution. A paper out of this dissertation has also been presented by me at a seminar/conference at the Department of Comparative Literature, thereby fulfilling the criteria for submission, as per the M.Phil Regulation (2017) of Jadavpur University.

(Dhaneswar Barman)
(Full signature of the M.Phil Student with Roll number and Registration number)
Class Roll no. 001700203016, Reg. no. 133489 (2015-2016)
Mphil Examination Roll no. MPCO194016

On the basis of academic merit and satisfying all the criteria as declared above, the dissertation work of Dhaneswar Barman entitled **"আলিপুরদুয়ার জেলার লুপ্তপ্রায় রাভা সমাজ ও সংস্কৃতি একটি সমীক্ষা"**, is now ready for submission towards the partial fulfillment of the Degree of Master of Philosophy (Arts) in Comparative Literature of Jadavpur University.

Head	Supervisor & Convener of RAC	Member of RAC

Department of Comparative Literature

প্রস্তাবনা

পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী জনজাতির মধ্যে রাভা অন্যতম একটি জনগোষ্ঠী। মূলত উত্তরবঙ্গের আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার জেলার চা-বাগিচা অঞ্চল এবং বনাঞ্চলগুলির পার্শ্ববর্তী ভূ-ভাগেই এই জনগোষ্ঠীর বাস। তবে এই তিন জেলার মধ্যে আলিপুরদুয়ার জেলার জলদাপাড়া অভয়ারণ্য লাগোয়া শালকুমারহাট অঞ্চলে অধিকাংশ রাভা জনজাতির মানুষ বাস করে। বেঁচে থাকার জন্য বন-জঙ্গল, নদী, চা-বাগানের উপরই এরা নির্ভরশীল। মানুষের বর্তমান, অতীত এবং ভবিষ্যৎ ব্যাখ্যা করতে গেলে আমাদের লোকসংস্কৃতি দ্বারস্থ হতে হয়। একটি বিশেষ অঞ্চলের বহুবিচিত্র জাতি-জনজাতির অবস্থান তাদের আচার-আচরণ,ব্যবহার, জীবনচর্চা, পোশাক-পরিচ্ছেদ, কথা বলার বিশেষ ভঙ্গি ও উচ্চারণ, বাড়ি-ঘর তৈরি, চাষবাস, পশুপালন, সবকিছু নিয়েই একটি মানবসমাজের জীবন ও সংস্কৃতি তৈরি হয়। আমার গবেষণার বিষয় "আলিপুরদুয়ার জেলার লুপ্তপ্রায় রাভা সমাজ ও সংস্কৃতি একটি সমীক্ষা"। এই গবেষণাপত্রে উক্ত সম্প্রদায়ের হারিয়ে যেতে বসা সামাজিক রীতিনীতি, লোকসংগীত, লোককথা, নৃত্য, পূজা-পার্বণ, জন্ম-বিবাহ-মৃত্যু, মন্ত্র-তন্ত্র, ভাষা-সাহিত্য, পোশাক-পরিচ্ছদ, অলংকার, মুখোশ শিল্প, তাঁত শিল্প প্রভৃতি বিষয়ে বিশদ বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ এক সময় যা ছিল পূর্ণ মহিমায় কিন্তু সময়ের নিরিখে সেগুলি আজ লুপ্তপ্রায়। কালের প্রয়োজনে তা হয়ে থাকে। সভ্যতার অগ্রগতি যত ঘটবে মানুষের চাহিদার কাছে প্রয়োজনহীন বিষয়গুলি ক্রমশ হারিয়ে যাবে। আবার সেই সূত্র ধরেই সৃষ্টি হবে লোকসংস্কৃতির নতুন নতুন বিষয়।

ধনেশ্বর বর্মন

তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা-৭০০০৩২

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

উচ্চশিক্ষায় গবেষণা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। গবেষণার ধরন যেমন বিভিন্ন তেমনি গবেষণার পদ্ধতিও বহুপ্রকার। যদিও গবেষণাক্ষেত্রে প্রবেশের পূর্বে স্নাতকোত্তর স্তরে অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা পদ্ধতি বিষয়ে পাঠদান করা হয়, তা সত্ত্বেও আমরা অনেক সময় দেখি গবেষককে কার্যক্ষেত্রে প্রায়শই বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। তাই সেই সমস্যাগুলি থেকে গবেষণার বিষয়টি সঠিক পথে পরিচালিত করার জন্য একজন তত্ত্বাবধায়কের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। "আলিপুরদুয়ার জেলার লুপ্তপ্রায় রাভা সমাজ ও সংস্কৃতি একটি সমীক্ষা" শীর্ষক গবেষণাপত্রটি নিষ্পাদনের ক্ষেত্রে পদ্ধতিগত, তত্ত্বগত, ভাষাগত প্রভৃতি দিক দিয়ে আমাকেও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। এই সকল সমস্যায় যিনি আমাকে সর্বতোভাবে সহযোগিতা করেছেন, আমার আলোচ্য গবেষণাপত্রের তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক স্যমন্তক দাস মহাশয়। তাঁর নিকট আমি চির কৃতজ্ঞ। বিভিন্ন জটিল বিষয়কে তিনি অত্যন্ত সরল বাগভঙ্গি দ্বারা যেভাবে বোধগম্য করে তুলেন তা সত্যিই অনুকরণযোগ্য।

কৃতজ্ঞতা জানাই বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক সায়ন্তন দাশগুপ্ত মহাশয়কে, অধ্যাপক সুজিত কুমার মণ্ডল মহাশয়, অধ্যাপক সুমিতকুমার বড়ুয়া মহাশয়, এবং অধ্যাপক অনন্যা বড়ুয়া মহাশয়ার নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞ। বাংলা বিভাগীয় গ্রন্থাগারিক আইভি দি, হরিশ দাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। "আলিপুরদুয়ার জেলার লুপ্তপ্রায় রাভা সমাজ ও সংস্কৃতি একটি সমীক্ষা" গবেষণাপত্রটি তৈরি করার জন্য ক্ষেত্রসমীক্ষার উপর নির্ভর করতে হয়েছে। আলিপুরদুয়ার জেলার শালকুমারহাট অঞ্চলের রাভা জনজাতির মানুষের সঙ্গে কথোপকথন চলাকালীন প্রাসঙ্গিক ভিডিও, ভয়েস রেকর্ড ও ছবি তুলতে সাহায্য করেছে বন্ধু উমেশ চন্দ্র বর্মন, তাকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। ক্ষেত্রসমীক্ষায় তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করেছেন, আলিপুরদুয়ার জেলার শালকুমারহাট অঞ্চলের উক্ত সম্প্রদায়ের সদস্য সঞ্জয় রাভা, বিষ্ণু রাভা, ভবেশ রাভা, ধীরেন রাভা, রামসিং রাভা, যোগেশ রাভা, কান্তেশ্বর রাভা, দীনেশ রাভা, ললিতা রাভা, কান্দুরি রাভা, সমারি রাভা, বিনতা রাভা, সাবিত্রী রাভা, গীতা রাভা, রাজেন রাভা, সনেকা রাভা, কুমুদিনী রাভা, বিরেন রাভা। তাদের প্রতি রইলো শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা। আমায় প্রয়োজনীয় বইপত্র দিয়ে সহযোগিতা করেছেন বিশ্বজিৎ দা কৃষ্ণ দা, প্রদীপ রায়, স্বপন বর্মন, ভুবনেশ্বর বর্মন, লতিফ হোসেন, মনোজ কুমার রায়, দেবস্মিতা দি, তানিয়া সরকার, মানিরাগ সন্ধ্যা দাস, শংকর দাস, সম্রাট হেমব্রম।

এদের প্রতি ঋণ অশেষ। উত্তম, হিমাংশু, শুভম, শুভেন্দু, অরিন্দম, তপন, ইন্দ্র, অভিক, ধিরাজ, সহজিৎ, চিরঞ্জিত, সানাম নাসরিন শুরু থেকে পাশে থেকে টাইপ ও প্রুফের কাজে সহযোগিতা করেছে। ক্ষেত্রসমীক্ষায় প্রয়োজনীয় উপাদান সামগ্রী এবং বেশ কিছু ক্ষেত্রে মানসিক উৎসাহ যুগিয়েছেন মা, বাবা, দাদা, দিদি, তাদের কাছে ঋণ স্বীকার করা বাহুল্য মাত্র।

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
• ভূমিকা:	2 – 6
• প্রথম অধ্যায়: ক্ষেত্রসমীক্ষা'র অঞ্চল বিষয়ক তথ্য	7 – 18
• দ্বিতীয় অধ্যায়: রাভা জনজাতির উৎস কথা	19 – 46
➢ রাভা জনজাতির পরিচয়	
➢ বাসস্থান ও ঘরবাড়ি, আসবাবপত্র	
➢ পরিধেয় বস্ত্র ও অলংকার	
➢ শিক্ষা সমস্যা, পেশা, বাদ্যযন্ত্র	
➢ রাভা ভাষার পরিচয়	
➢ বিচার ব্যবস্থা ও গোত্র পরিচয়, ধর্ম	
• তৃতীয় অধ্যায়: রাভা সমাজের লুপ্তপ্রায় সংস্কৃতি	47 - 95
➢ গর্ভবতী মহিলাদের রীতি-নীতি	
➢ শিশুর নামকরণ, বিবাহ সংক্রান্ত বিধিনিষেধ	
➢ মৃতদেহ সৎকার ও শ্রাদ্ধের নিয়মাবলী	
➢ মাতৃজাতির প্রাধান্য, মদ্যপান তৈরি প্রণালী ও খাদ্য	
➢ রাভা গোত্রের বিধিনিষেধ, কারুশিল্প	
➢ দেব-দেবী ও পূজাপার্বণ	
➢ লোকনৃত্য	
➢ লোকগীত	
➢ ডাইনি তন্ত্র-মন্ত্র ও লোকচিকিৎসা	
• চতুর্থ অধ্যায়: রাভা জনজাতির অস্তিত্বের সংকট: অমিয়ভূষণ মজুমদারের কথাসাহিত্য	96 – 111
• ক্ষেত্রসমীক্ষায় সংগৃহীত প্রাসঙ্গিক ছবি সমূহ	112 – 119
• উপসংহার	120 – 122
• পরিশিষ্ট	123 - 147
➢ ক্ষেত্রসমীক্ষায় কথোপকথন	
➢ সংগ্রহ সূত্র	
• গ্রন্থপঞ্জি	148 – 150

ভূমিকা

ভারতের অন্যান্য উপজাতির মতোই 'রাভা' জনগোষ্ঠীর ইতিহাসও নৃতাত্ত্বিক গবেষণার বিষয় বস্তুতে পরিণত হয়েছে। 'রাভা' সম্পর্কে প্রথমে উল্লেখ পাওয়া যায় বুকালন হ্যামিলটনের রচনায় ১৮১০ সালে। ভাষাতাত্ত্বিক ও নৃতাত্ত্বিক পণ্ডিতগণের মতে রাভারা মঙ্গোলীয় গোষ্ঠীর শাখা। 'রাভা' শব্দটি এসেছে এদের জ্ঞাতি প্রতিযোগী গোষ্ঠী 'গারো'দের দেওয়া 'রাবা' থেকে। কিন্তু কালক্রমে রাভা একটি স্বতন্ত্র জাতিতে রূপান্তরিত হয় এবং ভারতীয় সংবিধানে স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। রাভা জনজাতির মানুষ অসম, মেঘালয়, ও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন ভৌগোলিক পরিবেশে অধ্যুষিত আছে। উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে রাভা জনজাতির মানুষের বাস লক্ষ করা যায়। প্রকৃতির খুব কাছের মানুষ বলে অরণ্য মায়ের কোলেই বেছে নিয়েছে। ভারতবর্ষের জনসংখ্যার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ হল উপজাতির মানুষ। এরা আদিবাসী, আদিম, অসভ্য, আরোপিত প্রভৃতি নামে পরিচিত। ভারতীয় সংবিধানে সাধারণত যাদের আমরা ফসিলভুক্ত উপজাতি হিসেবে চিহ্নিত করি। এই অংশের মানুষদের ভারতবর্ষের অধিকাংশ রাজ্যে আমরা দেখতে পাই। তবে সব রাজ্যে আনুপাতিক হার সমান নয়।

আমরা যদি আসাম ত্রিপুরা, মেঘালয়, মণিপুর, নাগাল্যাণ্ড রাজ্যগুলির দিকে তাকাই তাহলে দেখতে পাবো যে অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় অনেক বেশি জনজাতির মানুষজন এই রাজ্যগুলিতে বসবাস করছে। পশ্চিমবঙ্গে উপজাতি মানুষের সংখ্যা সাড়ে পাঁচ শতাংশ। উপজাতির মানুষজন নিজের রাজ্যের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিশেষত বন, কৃষি, অর্থনীতিতে উপজাতির মানুষের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এরা মূলত শ্রমিক, কৃষক, কেউ আবার জঙ্গল সামগ্রী সংগ্রহে এবং নদীতে মৎস্য শিকারে নিযুক্ত থাকেন। কিন্তু আমরা দেখি আদিবাসী মানুষকে সস্তায় শ্রমদান করতে হয়। এরা মোড়ল জমিদার, জোতদার ও স্থানীয় নেতাদের দ্বারা প্রতারিত। সময়ের তাগিদে এইসব মানুষেরা সংগ্রাম করেছে, নিজেদের প্রাপ্য বুঝে নিতে শিখেছে। ক্রমশ পশ্চিমের দিকে এসেছে কোচ রাভারা। কোচ বা কোঁচাই তাদের আদি পরিচয়। কোচরা 'কোচ' শব্দ প্রত্যাখ্যান করে আরও পশ্চিমে আজকের কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ারে আসার পথে ক্রমশ মিশে গেছে অন্য একটি বৃহৎ জাতির সঙ্গে।

এই জেলাগুলিতে রাজবংশী জাতির প্রাধান্য থাকায় রাজবংশীদের সঙ্গে কোচদের বিমিশ্রন উত্তরবঙ্গের ইতিহাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। একারণেই উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বসবাসকারী রাভা জনজাতির সমাজ-সংস্কৃতি, রাজবংশী জাতির সমাজ-সংস্কৃতি সাথে মিশে যাচ্ছে। উত্তরবঙ্গের প্রতিটি জেলার মানুষের মধ্যে নানা রকম ভাষা বৈচিত্র্য, সাংস্কৃতিক ভিন্নতা দেখা যায়। এর মূল কারণ নানা জনজাতির, গোষ্ঠীর অভিবাসনও স্থানান্তরীকরণ। কেননা উত্তরবঙ্গের আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার জেলায় একসময় ব্যাপক পরিমানে কৃষিজমি সম্প্রসারণ হয়েছিল সেই সূত্রে অরণ্য থেকে ভূমি উদ্ধারের প্রয়োজনে গোটা ভারত থেকে শ্রমিকের আগমন ঘটেছে এই জেলাগুলিতে। এছাড়াও চা-বাগিচা এবং অরণ্য নির্ভর কাঠ ও অন্যান্য ব্যবসা সূত্রে ভিন্ন ভিন্ন জনজাতির আগমন ঘটেছে।

আমরা যদি ইতিহাস ঘেঁটে দেখি তাহলে দেখব উত্তরবঙ্গের স্থানীয় উপজাতি সাধারণত মঙ্গোলীয় গোষ্ঠীর। কিন্তু উত্তরবঙ্গ বলে স্বতন্ত্র কোন ভূখণ্ড পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষের জাতীয় মানচিত্রে নেই। অথচ ব্রিটিশ শাসন কাল থেকেই লোকের মুখে মুখে উত্তরবঙ্গ দক্ষিণবঙ্গ কথাটির ব্যবহার লক্ষ করা যায়। এবিষয়ে সরকার কর্তৃক স্বীকৃত কোনো তথ্য-প্রমাণ যেমন নেই, তেমনি প্রাচীন ইতিহাসেও উত্তরবঙ্গ বলে কোন ভূখণ্ডের কথা পাওয়া যায় না। তবে বর্তমানে ৭টি জেলা নিয়ে সমগ্র খণ্ড উত্তরবঙ্গ নামে পরিচিত। উত্তরবঙ্গের ৭টি জেলার মধ্যে নবগঠিত জেলা আলিপুরদুয়ার ২০১৪ সালের ২৫শে জুন এই জেলা গঠিত হয়। এই জেলার উত্তরে অবস্থিত ভুটান রাষ্ট্র, পূর্বে অবস্থিত অসম রাজ্য, দক্ষিনে কোচবিহার জেলা, এই জেলার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে জলপাইগুড়ি দার্জিলিং জেলার সম্পর্ক। আলিপুরদুয়ার জেলার আলিপুরদুয়ার ১নং ব্লকের অন্তর্ভুক্ত একটি গ্রাম শালকুমারহাট এই অঞ্চলের অধিকাংশ লোকই রাভা সম্প্রদায়ের। সময়ের বিবর্তনে আসাম থেকে আগত এই সকল রাভা জনজাতির সমাজ সংস্কৃতির অনেক পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। নিজস্ব সংস্কৃতি ভুলে গিয়ে তারা রাজবংশীর সংস্কৃতির সাথে একত্রিত হয়ে উঠেছে। রাজবংশী আচার-অনুষ্ঠান, রীতি মেনে চলতে শুরু করেছে। তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি খুঁজে পাওয়া দুষ্কর হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আমি আমার এই গবেষণাপত্রে দেখাতে চেষ্টা করেছি যে, একসময় রাভা সমাজে মেনে চলা রীতিনীতি, পূজা-পার্বণ, উৎসব, নৃত্য-গীতগুলি কিভাবে তাদের সমাজ থেকে হারিয়ে যাচ্ছে এবং তাদের সংস্কৃতিগুলিকে কিভাবে রাজবংশী সংস্কৃতি গ্রাস করছে।

আমরা জানি যে সময়ের চাহিদার কাছে প্রয়োজনহীন জিনিসগুলি মূল্যহীন। অতএব কোন জনজাতির বা কোন সম্প্রদায়ের কোন সংস্কৃতি হারিয়ে যাওয়া মানেই তা শেষ কথা নয়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নতুন সংস্কৃতির জন্ম হবে এটাই স্বাভাবিক। আমার এই আলোচ্য গবেষণাপত্রে এই বিষয়টিই তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। আমার গবেষণাপত্রের বিষয় হল 'আলিপুরদুয়ার জেলার লুপ্তপ্রায় রাভা সমাজ ও সংস্কৃতি একটি সমীক্ষা' সঙ্গত কারণেই এটি আমার গবেষণা বিষয়ের নতুনত্ব।

আলিপুরদুয়ার জেলার আলিপুরদুয়ার ১নং ব্লকটি গড়ে উঠেছে ১১টি গ্রাম পঞ্চায়েত নিয়ে তার মধ্যে একটি হল শালকুমারহাট অঞ্চল। তবে কিছুদিন হল এই অঞ্চলকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে শালকুমার ১, শালকুমার ২। জলদাপাড়া অভয়ারণ্যের লাগোয়া শালকুমার অঞ্চলের নাম সর্বজনবিদিত। এখানে ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতির মধ্যে মিশ্রণ গড়ে উঠেছে যুগের হওয়ায় সময়ের ব্যবধানে। সবুজে ঘেরা শালকুমারহাট, জলদাপাড়া, মুন্সিপাড়া, প্রধানপাড়া, প্রভৃতি অঞ্চলে বসবাস করেছে বহু প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী কিছু জাতিসহ নানা সম্প্রদায়ের মানুষ। শালকুমারহাট অঞ্চলের চলতি ভাষা হিসেবে রাজবংশী ভাষার ব্যাপক প্রভাব লক্ষ করা যায়। নানা জনজাতির বাস হওয়ায় শালকুমারহাট অঞ্চলে বারো মাসে তেরো পার্বণের মত নানা লৌকিক অনুষ্ঠান বছরের প্রায় সময়ই হতে দেখা যায়। ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে তথ্যসংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করে আমার গবেষণাপত্রটি সম্পন্ন করেছি। এক্ষেত্রে বিশেষ সংস্কৃতি স্থাপক সামাজিক গোষ্ঠী তথা রাভাদের চেতন, ধ্যান-ধারণা, আচার-আচরণ, জীবনশৈলী অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা স্থান-কাল-পাত্র ভেদে ভাষার ব্যবহারের উপর বিশেষ গুরুত্ব রাখার চেষ্টা করেছি। এই অঞ্চলে ক্ষেত্রসমীক্ষা করতে গিয়ে নানারকম অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। এই অঞ্চলের বড় রাভাবস্তি, ছোট রাভাবস্তি এবং মুন্সিপাড়া মিলে প্রায় ২০০ পরিবার এই অঞ্চলে বসবাস করে। তাদের মধ্যে অনেকে ধর্মান্তরিত হয়ে খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করেছে। ভাষাগত পরিবর্তন তাদের মধ্যে লক্ষ করা যায়। শালকুমারহাটের রাভা বসতি অঞ্চলগুলির পার্শ্ববর্তী এলাকায় আমার বেড়ে ওঠা, সেই সূত্রে এই এলাকার রাভা সম্প্রদায়ের মানুষের সাথে দীর্ঘদিন মেশার সুয়োগ হয়েছে, এবং দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি এই অঞ্চলের বেশিরভাগ রাভাই রাজবংশী ভাষায় কথা বলে এবং এই অঞ্চলে রাজবংশী জাতির আধিপত্য থাকায় রাভা জনজাতির মানুষ রাজবংশী আচার-অনুষ্ঠান রীতি-নীতি গ্রহণ করছে।

আমি আমার গবেষণার কাজের জন্য রাভা জনজাতির মানুষের সাথে দীর্ঘ সময় ব্যয় করি এবং পর্যবেক্ষণ মধ্যে দিয়ে তাদের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে পরিচিত হই। ক্ষেত্রসমীক্ষায় লক্ষ করেছি এই এলাকার বর্তমানের তরুণ প্রজন্মের ছেলে-মেয়েদের মনে তাদের পুরাতন রীতি-নীতি নিয়ে তেমন কোনো ধ্যান ধারণায় নেই। তাই বেশি বয়স্ক, মধ্য বয়স্ক মানুষের সাথে কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে তথ্য সংগ্রহ করার চেষ্টা করেছি। ক্ষেত্রসমীক্ষায় উঠে এসেছে তাদের সমাজের বাস্তব জীবনের চিত্র। আসলে যে কোনো জাতির বাস্তব ছবি তুলে ধরতে গেলে ক্ষেত্রসমীক্ষার প্রয়োজন হয়। কেননা ক্ষেত্রসমীক্ষার মধ্যে দিয়েই যে কোনো জনজাতীর বাস্তব চিত্র ফুটে তোলা যায়। আমিও ক্ষেত্রসমীক্ষার মধ্যে দিয়ে সেই কাজটি করার চেষ্টা করেছি। আর এই ক্ষেত্রসমীক্ষার জন্য ভিডিও এবং রেকর্ডিং খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আলিপুরদুয়ার জেলার রাভা গ্রামগুলিতে ক্ষেত্রসমীক্ষা করতে গিয়ে তাদের কাছ থেকে পাওয়া তথ্য গুলি আমি ভিডিও এবং রেকর্ডিং এর মধ্যে দিয়ে সংরক্ষণ করে রেখেছি। আমার গবেষণাপত্রের জন্য যে প্রশ্নগুলোর উত্তর খোঁজার চেষ্টা করছি এবং সেসব প্রশ্নের উত্তর ইতিমধ্যেই পাওয়া গিয়েছে কিনা? কিংবা একই ধরনের গবেষণার কাজ ইতিমধ্যে হয়েছে কিনা তা জানার জন্য গভীর অধ্যয়ন ও সাক্ষাৎকার গ্রহণের প্রয়োজন হয়েছে। আমার প্রদত্ত গবেষণা অভিসন্দর্ভটি চারটি অধ্যায় এবং একটি পরিশিষ্ট অংশ নিয়ে সম্পূর্ণ করেছি।

প্রথম অধ্যায়ে আলিপুরদুয়ার জেলার পরিচিতি এবং রাভা বসতি অঞ্চলগুলির পরিচয়, জনসংখ্যা, ভৌগোলিক অবস্থান ও তাদের পারিপার্শ্বিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক পরিবেশ প্রভৃতি বিষয়ে বিশদ বিবরণ দেওয়ার চেষ্টা করেছি। এই জেলার রাভা গ্রামগুলি বেশিরভাগ আলিপুরদুয়ার জেলার আলিপুরদুয়ার-১নং ব্লকের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় এই ব্লকের জনসংখ্যা, সাক্ষরতা সম্পর্কেও বিশদ বর্ণনা করেছি।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে রাভা জনজাতির ইতিহাস পরিচয়, ঘরবাড়ি, শিক্ষা সমস্যা, পেশা, বাদ্যযন্ত্র পরিধেয় বস্ত্র ও অলংকার, খাদ্য, আসবাবপত্র, পেশা, শিকার, তাদের নিত্যদিনের অভাব-অনটন, চকোৎ (মদ্য) তৈরি, সামাজিক টানাপোড়ন, সরকারি ও বেসরকারি পদক্ষেপ প্রভৃতি বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে রাভা জনজাতির লুপ্তপ্রায় সংস্কৃতিগুলি, অর্থাৎ একসময় রাভা সমাজে যে নিয়ম-রীতিগুলি ছিল সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তা কিভাবে হারিয়ে যাচ্ছে। সামাজিক ট্যাবু, জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ

সংক্রান্ত নানা বিধিনিষেধ, গর্ভবতী মহিলাদের হারিয়ে যাওয়া লোকসংস্কার, শিশুর নামকরণ, লুপ্তপ্রায় মৃতদেহ সৎকার ও শ্রাদ্ধের নিয়মাবলী, ভিন্ন ভিন্ন পার্বণের সামাজিক রীতি-নীতি, হারিয়ে যেতে বসা মুখোশ শিল্প, লোকনৃত্য, লোকগীত সম্পর্কে যথাযথ তথ্যসংগ্রহ করে আলোচনা করার চেষ্টা করেছি।

চতুর্থ অধ্যায়ে অমিয়ভূষণ মজুমদারের *বিনদনি* (১৯৮৫) *সোঁদাল* (১৯৮৭) *মাকচক হরিণ* (১৯৯১) এই তিনটি উপন্যাস বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে রাভা জনজাতির অস্তিত্বের সংকটের কথা তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

পরিশিষ্ট অংশে রাভা সম্প্রদায়ের মানুষের সঙ্গে কথোপকথন এবং আমার গবেষণা অভিসন্দর্ভটি সম্পূর্ণ করতে আলিপুরদুয়ার জেলার যে সব রাভা জনজাতির মানুষেরা সহযোগিতা করেছেন তাদের পরিচয় তুলে ধরেছি।

প্রথম অধ্যায়

আলিপুরদুয়ার জেলার পরিচিতি ও সাধারণ রূপরেখা

ভূমিকা

পূর্বে আসাম সীমান্তে কুমারগ্রাম, উত্তর-পশ্চিমে ভুটান রাষ্ট্র এবং পশ্চিম দিকে রয়েছে জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং জেলা, দক্ষিণে কোচবিহার জেলা এবং বাংলাদেশ রাষ্ট্র, তার মাঝে আলিপুরদুয়ার জেলা। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের নবগঠিত ২০তম জেলা আলিপুরদুয়ার। ২০১৪ সালের ২৫শে জুন জলপাইগুড়ি জেলা থেকে পৃথক এই জেলা গঠিত হয়। জলপাইগুড়ি শহর থেকে জেলার অন্যান্য স্থানের বিশেষ করে কুমারগ্রাম, বারোবিশা, কামাখ্যাগুড়ি, কালচিনি ইত্যাদি স্থানের দূরত্ব বেশি হওয়ার কারণে, সেই অঞ্চলের মানুষের প্রশাসনিক ও বিভিন্ন ধরণের কাজে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হত। তাই আলিপুরদুয়ার জেলার দাবি ছিল দীর্ঘদিনের। আলিপুরদুয়ার জেলা হল ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের জলপাইগুড়ি বিভাগের পাঁচটি জেলার অন্যতম।

এই জেলা চা-চাষ এবং বন্যপ্রাণী সমৃদ্ধ ঘন বনাঞ্চলের জন্য পরিচিত। অবস্থান পাহাড়ের পাদদেশে। এই জেলার একটি বিরাট অংশে পর্যটন শিল্প গড়ে উঠেছে। কেননা এই জেলা উদ্ভিদকুল ও প্রাণীকুল দ্বারা সুন্দর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ। জেলার বেশিরভাগ এলাকাই চা-বাগান আর জঙ্গলে ঘেরা। চা-চাষ এখানকার একটি প্রধান শিল্প। এটি মূলত একটি গ্রামীণ জেলা, গ্রামগুলিতে বৃহৎ সংখ্যক মানুষ বসবাস করে। তবে এই জেলা কৃষিভিত্তিক এবং এখানকার অধিকাংশ মানুষই কৃষিক্ষেত্রে নিযুক্ত। এছাড়াও এই জেলার কাঠ বিখ্যাত এবং বর্তমানে অনেকে কাষ্ঠশিল্পের পেশায় যুক্ত।

বর্তমানে এই জেলায় অনেক পর্যটন শিল্প গড়ে উঠেছে যা ভবিষ্যতে বেড়ে ওঠার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। পর্যটন কেন্দ্রগুলি উদ্ভিদকুল ও প্রাণীকুলের সমন্বয়ে গঠিত হওয়ায় দেশের মধ্যে এবং দেশের বাইরের বহু পর্যটকদের আকর্ষণ করেছে। এখানকার গুরুত্বপূর্ণ আকর্ষণ হল জলদাপাড়া অভয়ারণ্য, ও বক্সা জাতীয় উদ্যান। এখানে পর্যটকরা গণ্ডার, চিতাবাঘ, হাতি দেখার সুযোগ পান। সবুজ চা-গাছের গালিচা বিছানো জেলায় কোল, মুণ্ডা, সাঁওতাল, মেচিয়া, রাভা সহ বিভিন্ন জনজাতির বসবাস। আলোচ্য অধ্যায়ে আলিপুরদুয়ার জেলার পরিচিতির সঙ্গে সঙ্গে এই জেলায় বসবাসকারী রাভা জনজাতির বাসযোগ্য অঞ্চলগুলি ও তাদের পরিসংখ্যান দেখানো হয়েছে।

আলিপুরদুয়ার জেলার সংক্ষিপ্তসার

২০১১ সালের জনগণনার সময় জলপাইগুড়ি জেলার একটি মহকুমা হিসাবে আলিপুরদুয়ার অন্তর্ভুক্ত ছিল। ২০১১ সালের পরবর্তী সময়ে (২০১৪) জলপাইগুড়ি জেলা থেকে পৃথক আলিপুরদুয়ার জেলা গঠিত হয়। ২০১১ সালের জনগণনা অনুসারে আলিপুরদুয়ার মহকুমা সর্ম্পকে যে তথ্য পাই তা বর্তমান জেলা তথ্য হিসাবে দেখানো হল -

রাজ্য	পশ্চিমবঙ্গ।
জেলা	আলিপুরদুয়ার।
ভৌগোলিক অবস্থান	২৬.৪৮° উত্তর, ৮৯.৫৭°পূর্ব।
জেলা কোড	AD
জেলা সদর দপ্তর	আলিপুরদুয়ার।
মহকুমা	আলিপুরদুয়ার।
লোকসভা	আলিপুরদুয়ার (সংরক্ষিত তপশিলি উপজাতি)।
বিধানসভা	৫টি, ফালাকাটা (এসসি), মাদারিহাট (এসটি), কুমারগ্রাম (এসটি), আলিপুরদুয়ার, কালচিনি (এসটি)।
ব্লক	৬টি, ফালাকাটা, আলিপুরদুয়ার ১, আলিপুরদুয়ার ২, মাদারিহাট-বীরপাড়া, কালচিনি, কুমারগ্রাম।
থানা	৮টি, আলিপুরদুয়ার, শামুকতলা, কুমারগ্রাম, ফালাকাটা, কালচিনি, জয়গাঁও, মাদারিহাট, বীরপাড়া।
সেন্সাস টাউন	৯টি, পশ্চিম জিৎপুর, চিচাখাতা, আলিপুরদুয়ার রেলওয়ে জংশন, ভোলার ডাবরি, শোভাগঞ্জ, ফালাকাটা, জয়গাঁও, উত্তর ল্যাটাবাড়ি, উত্তর কামাখ্যাগুড়ি।
গ্রাম পঞ্চায়েত	66 টি।

জনসংখ্যা (২০১১)	১৪৯১২৫০ জন। পুরুষ-৫১% মহিলা-৪৯%। ৬ বছরের নিচে ৮.৫৭%।

আয়তন	২৮৪১ (বর্গ কিলোমিটার) ১০৯৭ (বর্গমাইল)।
জনঘনত্ব (প্রতি বর্গ কিলোমিটার)	৫২০ জন।
সাক্ষরতা	মোট গড়ে : ৭২%।
নদীসমূহ	তোর্সা, হলং, মুজনাই, রায়ডাক, কালজানি, সংকোশ।
জাতীয় উদ্যান	২টি, বক্সা জাতীয় উদ্যান এবং জলদাপাড়া অভয়ারণ্য।
পর্যটনস্থল	বক্সা ব্যাঘ্র সংরক্ষণ, চিলাপাতা অরণ্য, জলদাপাড়া বন্যপ্রাণী। অভয়ারণ্য, ছোটা সিঞ্চুলা, জয়ন্তী, চিলাপাতা, রায়মাটাং ইত্যাদি।
জেলার ভাষা	নেপালী (৯.৭৮%)। রাভা (০.৮২%)। মুণ্ডারি (০.৭৭%)। বাংলা (৫৭.৫১%)। হিন্দী (৫.৩৭%)। সাদরি (১৭.০৩%)। সাঁওতালি (১.৩৮%)। ওরাঁও (৩.১৮%)। অন্যান্য (৪.১৬%)।
লোকসংস্কৃতি	ভাওয়াইয়া, বিষহরা, আদিবাসী জনগোষ্ঠীর নৃত্যগীত।
স্থানীয় জনজাতি	টোটো, মেচ, রাভা, গারো ইত্যাদি।
বহিরাগত জনজাতি	ওরাঁও, মুণ্ডা, সাঁওতাল।

বিরল জনজাতি	টোটো (মাদারিহাট ও শামুকতলাতে কিছু দেখা যায়)।
অরন্যভূমি	এই জেলার ৭৩৪৩৯৬ হেক্টর অরণ্যভূমি রয়েছে।[১]

মহাবিদ্যালয়/বিশ্ববিদ্যালয়	আলিপুরদুয়ার মহাবিদ্যালয়, আলিপুরদুয়ার মহিলা মহাবিদ্যালয়, বীরপাড়া মহাবিদ্যালয়, ফালাকাটা মহাবিদ্যালয়, শহীদ ক্ষুদিরাম মহাবিদ্যালয়, বিবেকানন্দ মহাবিদ্যালয়, লীলাবতী মহাবিদ্যালয়, ননী ভট্টাচার্য স্মারক মহাবিদ্যালয়, শামুকতলা সিধু কানু মহাবিদ্যালয়, পীযূষ কান্তি মুখার্জী মহাবিদ্যালয় ইত্যাদি।[2]
জলবায়ু	এই জেলার গড় বাৎসরিক তাপমাত্রা সর্বনিম্ন ২৪ থেকে ৩৭ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেট। গড় বাৎসরিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ প্রায় ১৮ হাজার মিলিমিটার যার শতকরা ৮০ ভাগ জুন থেকে সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে ঘটে। বাতাসে আপেক্ষিক আদ্রর্তার পরিমাণ ৮৬ শতাংশ।[৩]
অফিসিয়াল ওয়েবসাইট	*http://alipurduar.gov.in*

পশ্চিমবঙ্গের মানচিত্রে আলিপুরদুয়ার জেলার অবস্থান।[৪]

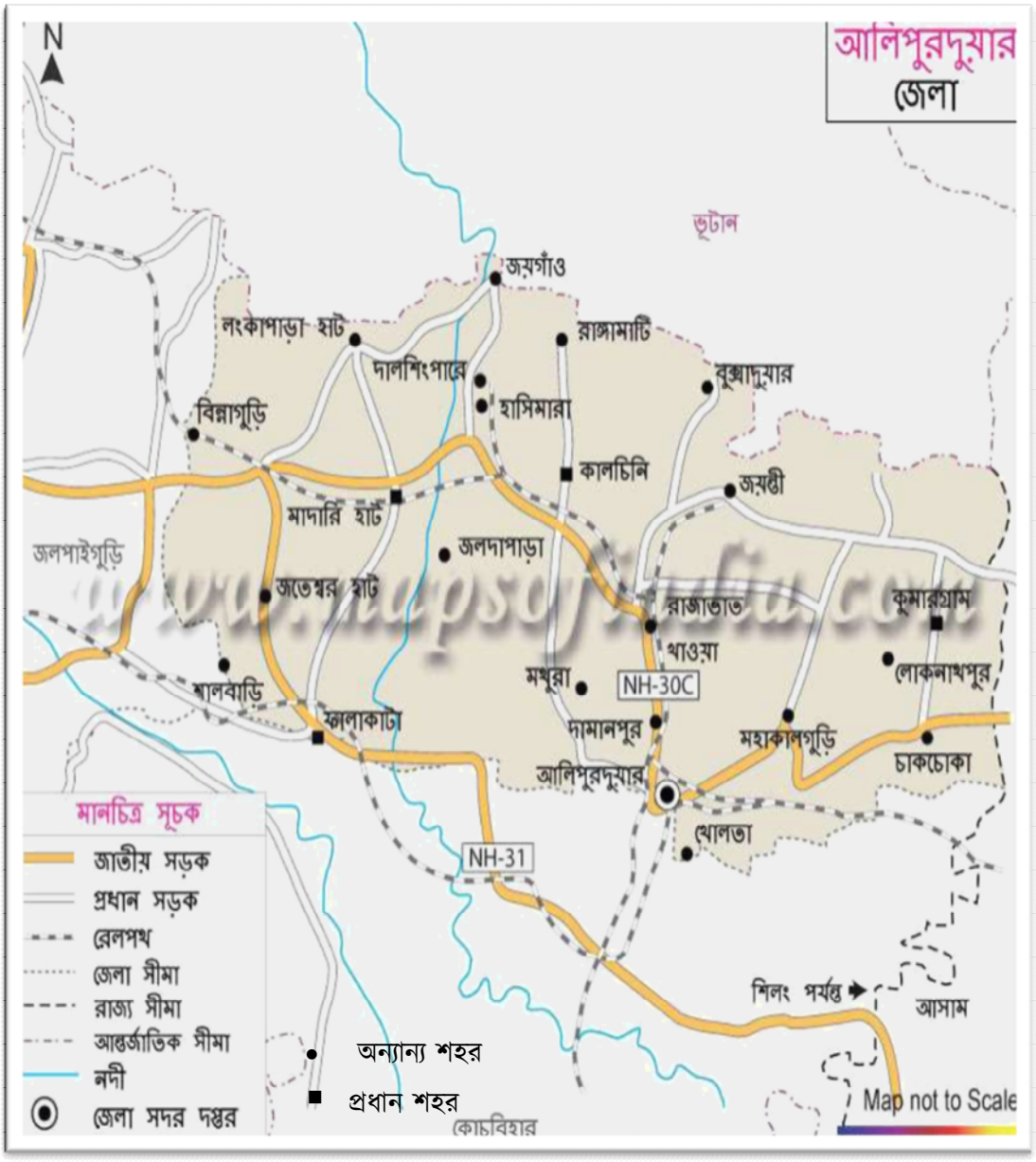

আলিপুরদুয়ার
জেলা
N
ভূটান
জয়গাঁও
লংকাপাড়া হাট
রাঙ্গামাটি
বুক্সাদুয়ার
হাসিমারা
বিন্নাগুড়ি
কালচিনি
জয়ন্তী
মাদারি হাট
জলদাপাড়া
জলপাইগুড়ি
জতেশ্বর হাট
রাজাভাত
খাওয়া
কুমারগ্রাম
মথুরা
NH-30C
লোকনাথপুর
শালবাড়ি
ফালাকাটা
দামানপুর
মহাকালগুড়ি
চাকচোকা
আলিপুরদুয়ার
খোলতা
NH-31
মানচিত্র সূচক
জাতীয় সড়ক
প্রধান সড়ক
রেলপথ
জেলা সীমা
রাজ্য সীমা
আন্তর্জাতিক সীমা
নদী
জেলা সদর দপ্তর
অন্যান্য শহর
প্রধান শহর
শিলং পর্যন্ত
আসাম
কোচবিহার
Map not to Scale

আলিপুরদুয়ার জেলা।[৫]

আলিপুরদুয়ার-১ ব্লক (গবেষণা কর্মের ক্ষেত্রসমীক্ষা অঞ্চল)

১১টি গ্রাম পঞ্চায়েত নিয়ে আলিপুরদুয়ার ১নং ব্লকটি গঠিত। এগুলি হল বঞ্চুকামারি, চকোয়াখেতি, মথুরা, পরোপার, পাতলাখাওয়া, পূর্ব কাঁঠালবাড়ি, শালকুমার-১, শালকুমার-২, তপসিখাতা, বিবেকানন্দ-১, বিবেকানন্দ-২। এই ব্লকের নগরাঞ্চল চারটি সেন্সাস টাউন নিয়ে গঠিত। এগুলি হল পশ্চিম-জিৎপুর, ছেচকাটা, আলিপুরদুয়ার রেলওয়ে জংশন ও ভোলার ডাবরি। ব্লকটি আলিপুরদুয়ার থানার অন্তর্গত। আলিপুরদুয়ার জেলার আলিপুরদুয়ার ১নং ব্লকের অর্ন্তগত একটি গ্রাম পঞ্চায়েত নিয়ে যে আলিপুরদুয়ার ১নং ব্লকটি গড়ে ওঠে তার মধ্যে শালকুমার-১, শালকুমার-২, অঞ্চলে জেলার অধিকাংশ রাভা জনজাতির মানুষ বাস করে।

জলদাপাড়া অভয়ারণ্য লাগোয়া বর্ধিষ্ণু শালকুমারহাট অঞ্চলের নাম সর্বজনবিদিত। আলিপুরদুয়ার জেলার এই ব্লকের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বিভিন্ন জনজাতির মানুষ দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করছে। জলদাপাড়া অভয়ারণ্য এই ব্লকের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় বিভিন্ন জনজাতির মানুষেরা এই অভয়ারণ্যকেই আশ্রয়স্থল হিসাবে বেছে নিয়েছে। সবুজে ঘেরা শালকুমারহাট এলাকার জলদাপাড়া, সুরিপাড়া, মুন্সিপাড়া, প্রধানপাড়া, সিড়বাড়ি প্রভৃতি অঞ্চলে বসবাস করছে রাভা জনজাতি সহ নানা সম্প্রদায়ের মানুষ। তবে এই অঞ্চলের মুন্সিপাড়া, বড়ো রাভাবস্তি, ছোট রাভা বস্তি মিলে প্রায় ২০০ ঘর রাভা জনজাতির মানুষের বাস।[৬] এই অঞ্চলগুলোতে অন্যান্য জনজাতির থেকে রাভা জনজাতির মানুষের বাস বেশি। এই গ্রামগুলিতে বসবাসকারী রাভা মানুষেরা খুবই সহজ সরল এবং সাধারণ জীবন যাপন করত। একসময় এখানকার রাভা পুরুষ খুবই অলস ছিল। কাজের অভাবই এদের অলসতার মূল কারন ছিল। দিনের বেশিরভাগ সময়ই তারা তাদের তৈরি চকোৎ (মদ) খেয়ে সময় কাটাত। জমির মালিকানা রাভা মহিলাদের হাতে থাকায় সংসারে তাদের একটা প্রাধান্য ছিল। তাই রাভা পরিবারের মহিলারাই একসময় সংসার চালানোর দায়িত্ব নিত। এমনকি জীবিকার প্রয়োজনে রাভা মহিলারাই তাঁতশিল্পকে পেশা হিসেবে নিয়েছিল। এই অঞ্চলের মহিলাদের তৈরি তাঁতশিল্পের একসময় খুবই নাম ছিল। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই অঞ্চলে রাভা জনজাতির অনেক অগ্রগতি হয়েছে। পুরুষরা অলসতা থেকে বেরিয়ে এসে কর্মঠ হয়েছে। এই অঞ্চলে বর্তমানে অনেক হিন্দু রাভা থেকে খ্রিস্টানধর্মে ধর্মান্তরিত হচ্ছে। এইসব অঞ্চলের মানুষেরা কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত। এই অঞ্চলে রাজবংশী সংস্কৃতির প্রভাব বেশি থাকায় রাভা সংস্কৃতি রাজবংশী সংস্কৃতি সঙ্গে মিশে যাচ্ছে।[৭]

আলিপুরদুয়ার ১নং ব্লক

মোট আয়তন	৩৭৮.৬০ বর্গ কি.মি.।
মোট জনসংখ্যা	২১৬৯৩১ জন। পুরুষ- ১১১৩৭৮ জন (৫১.৩৪%)। মহিলা- ১০৫৫৫৩ জন (৪৮.৬৬%)। গ্রামীণ এলাকায় মোট জনসংখ্যা- ১৬০৭৬০ জন (৭৪.১১%)। শহর এলাকায় মোট জনসংখ্যা- ৫৬১৭১ জন (২৫.৮৯%)। ৬ বছরের নিচে মোট জনসংখ্যা- ২৪৩৮১ জন (১১.২৩%)।
শিক্ষার হার	৬৭.৬২% (১৪৬৭০২)। পুরুষ- ৫৫.৩৪% (৮১১৯১)। মহিলা- ৪৪.৬৬% (৬৫৫১১)।
তফশিলি জাতি	১০৫০১৭ জন (৪৮.৪১%)। পুরুষ- ৫৪২৪১ জন (৫১.৬৫%)। মহিলা-৫০৭৭৬ জন (৪৮.৩৫%)।
তফশিলি উপজাতি	৩৬৬০৫ জন (১৬.৮৭%)। পুরুষ- ১৮৭৭৪ জন (৫১.২৯%)। মহিলা- ১৭৮৩১ জন (৪৮.৭১%)।
গ্রাম পঞ্চায়েত	১১ টি।
মূল কার্যালয়	পাঁচকালগুড়ি।
মহকুমা	আলিপুরদুয়ার।
এরিয়া কোড	০০২২।
পিন কোড	৭৩৬১২১।
ভাষা ব্যবহার	বাংলা, রাজবংশী, হিন্দি, নেপালি, রাভা, মেচ।
মহাবিদ্যালয়/বিশ্ববিদ্যালয়	বিবেকানন্দ মহাবিদ্যালয়, পীযূষ কান্তি মুখার্জী মহাবিদ্যালয়।[৮]

আলিপুরদুয়ার-১নং ব্লকের অর্ন্তগত রাভা বসতি গ্রামগুলির তফশিলি জাতি ও তফশিলি উপজাতি পরিসংখ্যান -

গ্রাম	তফশিলি জাতি	তফশিলি উপজাতি
শালকুমারহাট	৪৬৩১ জন। পুরুষ- ২৩৮৯ জন। মহিলা- ২২৪২ জন।	৬০৮ জন। পুরুষ- ৩২১ জন। মহিলা- ২৮৭ জন।
মুন্সিপাড়া	৮৯২০ জন। পুরুষ- ২৫২৫ জন। মহিলা- ২৩৯৫ জন।	৭০২ জন। পুরুষ- ৩৭৬ জন। মহিলা- ৩২৬ জন।
সুরিপাড়া	২৫৭১ জন। পুরুষ- ১৩৫৩ জন। মহিলা- ১২১৮ জন।	৩৪০ জন। পুরুষ- ১৮৬ জন। মহিলা- ১৫৪ জন।
শালকুমারহাট বনাঞ্চল	৬ জন। পুরুষ- ৩ জন। মহিলা- ৩ জন।	৩২৫ জন। পুরুষ- ১৫৬ জন। মহিলা- ১৬৯ জন।
সিধাবাড়ি	২৫৪৯ জন। পুরুষ- ১৩৩ জন। মহিলা- ১২১৬ জন।	৯৮৯ জন। পুরুষ- ৫০৫ জন। মহিলা- ৪৮৪ জন।
কলাবেরিয়া	২০৩০ জন। পুরুষ- ১০০৭ জন। মহিলা- ১০২৩ জন।	৫৯১ জন। পুরুষ- ২৯৪ জন। মহিলা- ২৯৭ জন।
নতুন পাড়া	১৮০৮ জন। পুরুষ- ৯৫৮ জন। মহিলা- ৮৫০ জন।	৭৮৭ জন। পুরুষ- ৩৯৫ জন। মহিলা- ৩৯২ জন।
দক্ষিন বারাঝার বনাঞ্চল	১৫ জন। পুরুষ- ৭ জন। মহিলা- ৮ জন।	১০৯১ জন। পুরুষ- ৫৫৯ জন। মহিলা- ৫৩২ জন।[৯]

পশ্চিমবঙ্গের মানচিত্রে আলিপুরদুয়ার ১নং ব্লকের অবস্থান।[১০]

উপসংহার

আলিপুরদুয়ার জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে দীর্ঘদিন ধরে বসবাসকারী রাভা জনজাতি এই জেলার জনজীবনে সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করেছে বক্ষ্যমাণ আলোচনা তার পরিচয় বহন করে। উত্তরবঙ্গের জেলাগুলির মধ্যে আলিপুরদুয়ার জেলায় সবচেয়ে বেশি সংখ্যক বিভিন্ন জাতির মানুষের বাস। আলিপুরদুয়ার জেলার মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ। আলোচ্য অধ্যায়ে এই জেলার তপশিলি জাতি, উপজাতি মানুষের পরিসংখ্যান দিয়ে দেখানো হয়েছে তাদের বর্তমানে সামাজিক অবস্থান। জেলায় বন-জঙ্গলের পরিমাণ বেশি থাকায় বিভিন্ন জনজাতির মানুষের আগমন ঘটেছে।

তথ্যসূত্র

১. https://bn.wikipedia.org/wiki/alipurduar

২. *www.nbu.ac.in*

৩. *https://bn.wikipedia.org/wiki/alipurduar*

৪. *https://bn.wikipedia.org/wiki/alipurduar*

৫. https://bengali.mapsofindia.com/west-bengal/districts

৬. বিষ্ণু রাভা (পুরুষ, বয়স: ৫২, পেশা: কারুশিল্প, গ্রাম: ছোটবস্তি, গ্রাম পঞ্চায়েত অঞ্চল: শালকুমার ২, জেলা: আলিপুরদুয়ার)। ০৪-০২-২০১৮

৭. যোগেশ রাভা (পুরুষ, বয়স: ২২, পেশা: দিন-মজুরি, গ্রাম: ছোটবস্তি, গ্রাম পঞ্চায়েত অঞ্চল: শালকুমার ২, জেলা: আলিপুরদুয়ার)। ০৪-০২-২০১৮

৮. *District Census Handbook Jalpaiguri.* Census of India 2011 West bengal. Series - 20 Part XII-B, Directorate of Census Operation West Bengal. P.178.

৯. *District Census Handbook Jalpaiguri.* Census of India 2011 West bengal. Series - 20 Part XII-B, Directorate of Census Operation West Bengal. P.179.

১০. https://bn.wikipedia.org/wiki/alipurduar

দ্বিতীয় অধ্যায়

রাভা জনজাতির উৎস কথা

ভূমিকা

ভারতের অন্যান্য উপজাতির মতই রাভা জনগোষ্ঠী ভারতীয় সংবিধানে 'জনজাতি' হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে। উত্তর-পূর্ব ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বসবাসকারী রাভা জনজাতি নানা কারণে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তারা প্রধানত আসামের কোকরাঝাড়, গোয়ালপাড়া, বঙ্গাইগাঁও, কামরূপ, শোণিতপুর, দরং, ধুবড়ী, মেঘালয়ের পশ্চিম গারো-পাহাড় জেলা, পশ্চিমবঙ্গের আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি জেলায় বাস করে। রাভাদের উৎপত্তি বসতি ও জাতিগত পরিচয় নিয়ে বিস্তর মতভেদ রয়েছে। আমার আলোচ্য গবেষণাপত্রের এই অধ্যায়ে রাভা জনগোষ্ঠীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয়, এবং উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বসবাসকারী রাভা জনজাতির বর্তমান সামাজিক অবস্থান, তাদের ঘরবাড়ি, আসবাবপত্র, শিক্ষা সমস্যা, পেশা, বাদ্যযন্ত্র, ভাষা পরিচয়, বিচার ব্যবস্থা, গোত্র পরিচয় সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে।

রাভা জনজাতির পরিচয়

নৃতাত্ত্বিক বিচারে মঙ্গোলয়েড গোষ্ঠীগুলির মধ্যে একটি বিশিষ্ট উপজাতি রাভা। এই জনজাতি সম্পর্কে প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় বুকালন হ্যামিলটনের রচনায় ১৮১০ সালে। এল. এ. ওয়াডেল মনে করেন রাভা আলাদা কোনো জাতি নয়, কাছারিদের একটি শাখামাত্র। স্যার ই. এ. গ্যাইট মনে করেন রাভাদের জাতি পরিচিতি এত অনিশ্চিত যে, এরা কারা সঠিকভাবে বলা মুশকিল। বি. এইচ. হডসন ১৮৮০ সালে মন্তব্য করেন যে, রাভা বোড়ো জাতিরই অবিচ্ছেদ্য অংশ। এছাড়া অনেক ভাষাতাত্ত্বিক ও নৃতাত্ত্বিক পণ্ডিতগণের মতে রাভারা ইন্দো-মঙ্গোলীয় কোচ গোষ্ঠীর অন্তর্গত। *অন্তেবাসী সমাজ, সংস্কৃতি ও উন্নয়ন* প্রবন্ধ গ্রন্থে রূপকুমার বর্মন মন্তব্য করেন –"রাভারা মূলত কোচভাষা ও বোডো সংস্কৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত একটি সাংস্কৃতিক জনগোষ্ঠী, জাতি-সাংস্কৃতিক বৈপরীত্য (Racio-Cultural Contradicition) সংবিধান অনুযায়ী খানিকটা দূরীভূত হয়ে রাভাদের তপশিলি উপজাতি (Scheduled Tribe) এর মর্যাদা দান করলেও জাতি না

সংস্কৃতি এই জনগোষ্ঠীর পরিচিতির মানদণ্ড হওয়া উচিত, সেই প্রশ্নের কোনো সঠিক সমাধান হয়নি।"[১] তবে একসময় রাভা জনগোষ্ঠীকে 'অনির্দিষ্ট' জাতির তকমা বহন করতে হত। রাভা সমাজের প্রচলিত মতানুসারে ঈশ্বর সৃষ্ট এক দম্পতি থেকে বিভিন্ন কন্যার জন্ম হয় তাদের থেকে পরবর্তীতে রাভাদের বিভিন্ন শাখার উৎপত্তি ঘটে। অতীতে রাভারা কোচ নামেই পরিচিত ছিলেন। কোচ রাভাদের পাঁচটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত করা হত, (রংদানিয়া, পাতি, দুহড়ী, মায়তোরী, কোচ)। সুনীল পাল তার *রাভা লোকমানস* গ্রন্থে বলেছেন –"কোচদের লোকগাথানুসারে দেখা যায় কোচ, মেচ, লেপচা, ওরাই এরা হলেন চার ভাই যারা স্বর্গ (রাংকারাং) থেকে পৃথিবীতে (হাসং) এসেছিলেন দেবতা ঋষিবাই (রাভাদের প্রধান দেবতা) এর নির্দেশে।"[২] মিনহাম্-উদ্দিন সিরাজের *তাবাকৎই নাসীরি* গ্রন্থে উল্লেখ আছে ১২০৬ খ্রিস্টাব্দে বখতিয়ার উদ্দিন যখন লক্ষণাবতী জয়ের পর তিব্বত অভিযান করেছিলেন তখন হিমালয়ের পাদদেশে, বাংলার উত্তরে কোচ, মেচ, থারু নামে তিনটি জাতি বাস করত। কোচ রাভারা বৃহত্তম বোড়ো ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত বলে অনেকে মনে করেন। কোচ নামটি এই জাতির অতিপ্রাচীন ও ঐতিহ্যপূর্ণ নাম। কিন্তু কালক্রমে রাভা একটি স্বতন্ত্র জাতিতে রূপান্তরিত হয়। ভারতীয়ও সংবিধানে রাভারা একটি স্বতন্ত্র জনজাতির মর্যাদা লাভ করে। ফ্রেণ্ড পেরেরাও একটি গল্পের নির্দেশ করে বলেছেন, প্রথমে দিকে রাভারা গারো পাহাড়ে বসবাস শুরু করে কিন্তু সেখানে গারোদের সঙ্গে অবিরত লড়াই শুরু হয় ফলে তারা সমতল ভূমির দিকে (গোয়ালপাড়া) নেমে আসে।

একসময় আসামের ধুবড়ী, কোকড়াঝাড়, গোয়ালপাড়া, কামরূপ, শোণিতপুর জেলা, মেঘালয়ের প্রবণতা পশ্চিম গারোপাহাড় জেলায় রাভা জনজাতির বাসস্থান লক্ষ করা যেত। কিন্তু সময়ের ব্যবধানে আজ রাভা জাতির বাসস্থান ও সংস্কৃতির অনেক পরিবর্তন ঘটতে দেখা যায়। ১৯০৩ সালে প্রকাশিত *Linguistic Survey Of India Vol-III, PT-II* এর রিপোর্ট অনুসারে আসামের গারো পাহাড় জেলার ফুলবাড়ি'র পরাদক্ষিণে, এবং খাচীয়া পাহাড় জেলার উত্তর সীমান্তবর্তী কিছু অঞ্চলকে বাসভূমি হিসাবে বেচে নেয়। কিন্তু পরবর্তীতে ধীরে ধীরে বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে এবং পাহাড়ের কোল থেকে কিছু সংখ্যক মানুষ সমভূমির দিকে বিশেষত উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে নামতে থাকে।

উত্তরবঙ্গের জনজীবন ও লোকাচার গ্রন্থে ধনেশ্বর বর্মন বলেছেন উত্তরবঙ্গে রাভারা কবে এসেছিল সে সম্পর্কে সঠিকভাবে কিছু বলা সম্ভব নয়। তবে সম্ভবত যিশুখ্রিস্টের জন্মের দু-হাজার বছর

আগে মহাচীনের ইয়াং-সি-কিয়াং ও হোয়াং-হো নদীর অববাহিকা থেকে পশ্চিম দিকে একদল লোক যাত্রা শুরু করে। যাত্রাপথে এই দলের লোকেরা দুটি ভাগে ভাগ হয়ে যায়। তাদের মধ্যে একটি দল তিব্বত ও ব্রহ্মদেশ হয়ে ভারতের মিজোরাম, মণীপুরে, অসম, নাগাল্যাণ্ড, অরুণাচল, এসে বসবাস শুরু করার চেষ্টা করে। অন্য দলটি আর একটু পশ্চিমের দিকে গিয়ে উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলার তিস্তার অববাহিকা পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে তরাই ও ডুয়ার্স এলাকায় বসবাস শুরু করার চেষ্টা করে। এই অঞ্চলগুলিতে যারা বসবাস শুরু করতে থাকে তারাই রাভা বলে পরিচিতি লাভ করে।

উত্তরবঙ্গের আলিপুরদুয়ার জেলার শালকুমারহাট, দক্ষিণ-পূর্ব শালবাড়ি, কামাখ্যাগুড়ি, হেমাগুড়ি, নারারখালি, রাধানগর, কালচিনি, মেন্দাবাড়ি, মাদারিহাট, রায়ডাক ইন্দুবস্তীর বনাঞ্চল, পারোকাটা, চিকলিগুড়ি, এই গ্রামগুলিতেই রাভাবস্তি দেখা যায়। তবে কুমারগ্রামের শিলিটং ও দক্ষিণ কামাখ্যাগুড়ি, গ্রামের রাভাদের সঙ্গে রাজবংশী ও মেচদের নিকট সম্পর্ক বর্তমান। অন্যদিকে পারোকাটা, চিকলিগুড়ি, শালকুমারহাট, প্রভৃতি গ্রামে বসবাসকারী রাভা মূলত জাতিহিন্দু ও রাজবংশীদের উপর নির্ভরশীল। কোচবিহার জেলার সমস্ত রাভা গ্রামই তুফানগঞ্জ মহকুমায় অবস্থিত (ভাবেয়া, বোচামারি, রসিকবিল, বড়ো শালবাড়ি) এবং জলপাইগুড়ি জেলার বিভিন্ন বনাঞ্চলের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে রাভাবস্তি দেখতে পাই।

বাসস্থান অনুসারে রাভা জনজাতিকে দুই ভাগে ভাগ করা হত, বনাঞ্চল পার্শ্ববর্তী রাভাবস্তি এবং জাতি হিন্দু অধ্যুষিত রাভাদের গ্রাম। *উত্তরবঙ্গের উপজাতির ইতিবৃত্ত* গ্রন্থে রণজিৎ দেব মন্তব্য করেন –"কোচবিহার, ও জলপাইগুড়ি জেলার তরাই অঞ্চলে কোচ রাভার জনসংখ্যা ছয় হাজারের বেশি। কোচবিহার জেলার ভারেয়া, বড় শালবাড়ি এবং জলপাইগুড়ি জেলার মধ্য, দক্ষিণ কামাখ্যাগুড়ি, হেমাগুড়ি-পূর্ব শালবাড়ি, নারারখালি রাধানগর, কালচিনি থানার নিমতি, মেন্দাবাড়ি, মাদারিহাট, রায়ডাক-ইন্দুবস্তির বনাঞ্চলে রাভা জনজাতির বাস।"[৩] এইসব অঞ্চলগুলিতে রাজবংশী সম্পদায়ের মানুষের সংখ্যা যথেষ্ট। ফলে তাদের সঙ্গে বহু জাতির ও বর্গের বিমিশ্রণ ঘটেছে। রেবতীমোহন সাহার মতে আসাম, ও মেঘালয়, পশ্চিমবঙ্গের, আদমশুমারি ও সমস্ত সরকারি নথিপত্র ঘাঁটলে কোচ ও রাভা সম্পর্কে স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। তাদের সরকারি নথিপত্রে কোচদের তফশিলি জাতি (Scheduled caste) এবং রাভাদের তপশিলি উপজাতি বা জনজাতি (Scheduled tribe) নামে পৃথক দুটি গোষ্ঠী হিসেবে গণ্য করা হয়েছে এই

রাজ্যগুলিতে। সরকারি ও বিভিন্ন বেসরকারি ক্ষেত্রে সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার আশায় 'কোচ' নামে পরিচিত মানুষেরা 'কোচের' পরিবর্তে 'রাভা' পদবি গ্রহণ অথবা তাদের গোত্রনামকে তারা পদবি রূপে ব্যবহার শুরু করে।

কোচবিহারের রাজাদের পূর্বপুরুষ ছিলেন কোচ সর্দার হরিদাস। হরিদাস মণ্ডলের পুত্র বিশু কামরূপে রাজত্ব করতেন। ই. টি. ডালটন বলেছেন বিশু হিন্দুধর্ম গ্রহণ করে নিজেকে বিশ্বসিং এবং নিজেকে রাজবংশী বলে পরিচয় দিয়েছেন। যারা হিন্দুধর্ম গ্রহণ করেননি তারাই রাভা হিসেবে পরিচিত হয়েছে। 'কম্বোজ' শব্দ থেকে 'কোচ' শব্দটি এসেছে বলে অনেকেই এই মত পোষণ করেন এবং তারা বলেন যারা দুর্বোধ্য ভাষায় কথা বলেন তারাই 'কোচ'। এইসব অঞ্চলে কোচ রাভারা বহু পূর্বে এসে বসতি স্থাপন করেছিলেন সে বিষয়ে ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তার *বাঙালির ইতিহাস* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। পৌরাণিক জনশ্রুতি থেকে জানা যায় যে, কোচদের প্রধান দেবতার ঋষি ও আদিপুরুষ হল কচ্ছে। ষোড়শ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত রাভাগন 'কোচ' নামেই পরিচিত ছিলেন। স্বাধীনোত্তর ভারতীয় নৃতাত্ত্বিক বি. এম. দাস তাঁর *Ethnic Affinities of the Rabhas, Gauhati* (1960) গ্রন্থে বলেছেন রাভারা মঙ্গোলীয় জাতির কোচ-বোড়ো গোষ্ঠীরই মানুষ।

১৯৯১ সালের আদমশুমারি অনুসারে রাভাদের মোট জনসংখ্যা ছিল ২৭১৩৫৭ (আসামে ২৩৬৯৩১) জন। মেঘালয়ে ২০৪৪৫ জন এবং পশ্চিমবঙ্গে ১১০৭১ জন। আদমশুমারি অনুসারে আসাম ও পশ্চিমবঙ্গের রাভা জনগগোষ্ঠীকে একটি সমতল অনুসূচিত আদিবাসী Scheduled tribe plain হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। তারা প্রধানত জীবিকার কারণেই আসাম, মেঘালয, পশ্চিমবঙ্গের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসবাস করতে থাকে। উত্তরবঙ্গে বসবাসকারী রাভাদের দুটো ভাগ দেখা যায়, তার মধ্যে একটি ভাগ গ্রামে বাস করে আরেকটি ভাগ উত্তরবঙ্গের বনাঞ্চলগুলির পার্শ্ববর্তী অঞ্চলকেই বেছে নিয়েছে। অরণ্যবাসীরা মূলত জড়োপাসক (Animist) গ্রামবাসীরা জড়োপাসক হলেও প্রতিবেশী রাজবংশীদের প্রভাবে এদের মধ্যে হিন্দুত্ব প্রবণতা লক্ষ করা যাচ্ছে। কেননা এই অঞ্চলগুলিতে রাজবংশীদের একটা আলাদা প্রাধান্য রয়েছে। ফলে গ্রামের কিছু সংখ্যক বর্ষীয়ানরা রাভা মানুষেরা রাভা ভাষা ব্যবহার জানলেও তরুণদের মধ্যে রাভা ভাষার ব্যবহার দেখা যায় না, তার জায়গায় বাংলায় স্থানীয় উপভাষার ব্যবহার ক্রমবর্ধমান বেড়ে চলেছে।

তাদের সামাজিক অনুষ্ঠান, ধর্মাচারণ বর্তমানে স্থানীয় প্রভাবশালী সমাজে দ্বারা প্রভাবিত। তেমনি ভাষা ও সংস্কৃতির ব্যাপক ভাবে প্রবাহিত হয়েছে। রাভা জনজাতির বিভিন্ন গোত্রের মানুষেরা নিজেদের মাতৃভাষায় বিলুপ্ত ঘটিয়ে পার্শ্ববর্তী প্রভাবশালী ভাষাকে ঘরে বাইরে এবং শিক্ষায়তনের ভাষা হিসেবে রপ্ত করে নিয়েছেন। তবে শিক্ষার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে তাদের মধ্য self identity চেতনা জাগ্রত হয়েছে। আমরা যদি ১৮৮১ সালের জনগণনার দিকে তাকাই তাহলে আসামের রাভা জনজাতির নিম্নরূপ তথ্য পাই -

জেলা	**জনসংখ্যা (রাভা জনজাতি)**
গোয়ালপাড়া	১৪২৯৩ জন।
কামরূপ	২২৭২৩ জন।
দবং	১৫০৯০ জন।
গারো পাহাড়	৩৭৫৮ জন।
অন্যান্য জেলা	৬০৮ জন।[৪]

অর্থাৎ ১৮৮১ সালের আদমশুমারি অনুসারে আমরা মোট ৫৬৮৯৯ জন রাভার পরিচয় পাই। কিন্তু সময়ের ব্যবধানে রাভা জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে অনেক গুণ। রাভা সম্পর্কে সমাজে প্রচলিত মতানুসারে ঈশ্বর সৃষ্ট এক দম্পতির থেকে বিভিন্ন কন্যার জন্ম হয় যাদের থেকে পরবর্তীতে রাভাদের বিভিন্ন শাখার উৎপত্তি ঘটে। ফ্রেণ্ড পেরেরার মন্তব্য করেন রাভারা প্রথমে গারো পাহাড়ে বসতি স্থাপন করে কিন্তু সেখানে অবিরত সংগ্রামের ফলে তারা সমতল ভূমিতে (গোয়ালপাড়া) নেমে আসেন। গারো পাহাড়ের অনেকে বিশ্বাস করেন যে, তাদের মধ্যে শক্তিশালী আট গোষ্ঠীর প্রধান 'হুসুং' রাভাদের গারো পাহাড়ের দিকে নিয়ে এসেছিলেন কৃষিকাজের জন্য। কেননা কোচ রাভারা কৃষিকাজে ছিলেন বেশি দক্ষ। *অন্তেবাসী সমাজ, সংস্কৃতি ও উন্নয়ন* প্রবন্ধ গ্রন্থে রূপকুমার বর্মন তাঁর একটি লেখায় মন্তব্য করেন –"অন্ত-উপজাতি সংগ্রামে ফলে তারা গারো পাহাড় ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। শুধু তাই নয় রাভা শব্দটি ও গারো ভাষা থেকে এসেছে যার অর্থ হল 'আহুত'। যেহেতু রাভারা গারো অঞ্চলে এসেছিলেন গারোদের আহ্বানে তাই 'রাবা' অর্থাৎ They have been brought সুতরাং মৌখিক ইতিহাস থেকে একথা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান যে 'রাভা বৃহৎ কোচ-বোড পরিবারের অংশ।"[৫]

জাতিগত দিক থেকে রাভারা আলাদা কোনো নৃগোষ্ঠী নয়। ভাষার দিক থেকে 'তিব্বতো চীনা' পরিবারের কোচ উপভাষাই তারা ব্যবহার করেন। ঔপনিবেশিক পর্যবেক্ষণও উত্তর পূর্ব ভারতের বিভিন্ন উপজাতির মধ্যে প্রচলিত লোককথা পরস্পর সামঞ্জস্য নয় অনেক ক্ষেত্রেই। ঔপনিবেশিক শাসককুল রাভাদের পৃথক নৃগোষ্ঠী হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু রাভারা মূলত কোচ ভাষা ও বোড়ো সংস্কৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে সম্পর্ক যুক্ত একটি সাংস্কৃতিক জনগোষ্ঠী। জাতির-সাংস্কৃতিক বৈপরীত্য সংবিধান অনুযায়ী রাভাদের তপশিলি উপজাতি এর মর্যাদা দান করলেও জাতি না জনগোষ্ঠী সেই প্রশ্নের কোনো সঠিক সমাধান হয়নি। পশ্চিমবঙ্গে ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে রাভা তপশিলি উপজাতির স্বীকৃতি পেয়েছে। নিম্নলিখিত আদমশুমারি গুলির দিকে তাকালেই দেখা যাবে পশ্চিমবঙ্গের রাভা জনসংখ্যার চিত্র অনেকটা বৈচিত্র্যময় -

	জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার (গড়)		আদমশুমারি অনুযায়ী
দশক	**পশ্চিমবঙ্গের**	**উত্তরবঙ্গ**	**রাভা**
১৯৫১-৬১	৩২.৮০%।	৪০.৪৯%।	১৮.৩৮%।
১৯৬১-৭১	২৬.৮৭%।	৩৩.০১%।	-৫৯.২৬%।
১৯৭১-৮১	২৩.১৭%।	২৭.৬৩%।	৩৫৬.৪৪%।
১৯৮১-৯১	২৪.৫৫%।	২৭.৬১%।	-৪৩.৮০%।[৬]

কর্ম ও জীবিকার ভিত্তিতে রাভারা (রংদানিয়া, পাতি, দাহুরি, মাইতোরী, কোচ) পাঁচ উপগোষ্ঠীতে মূলত বিভক্ত। কোচ গোষ্ঠী বাদে বাকি চারটি গোষ্ঠীর নামের উৎস সম্পর্কে মোটামুটি প্রচলিত ধারণা অনেকটা এরকম, রাভাদের সামাজিক অনুষ্ঠানের রঞ্জন দ্রব্য যোগানের ভার যাদের উপর ছিল তারা রংদানিয়া নামে পরিচিত ছিল। দাহুরী রাভারা লম্বা আকশীর সাহায্যে কাক তাড়ানোর দায়িত্বে ছিল। উৎসব অনুষ্ঠানে রান্না-বান্না ও পরিবেশনের ভার ছিল মায়তোরী রাভাদের ওপর। পাতি রাভাদের কাজ ছিল পাতা সরবরাহ করা। একসময় জীবিকার ভিত্তিতে রাভা উপগোষ্ঠী গুলির নামকরণ করা হয়েছিল, তা নিম্নে দেখানো হল -

রংদানি	উৎসবের উপস্থিতিতে হাজার হাজার মানুষের জন্য যারা পাথর কেটে আসন তৈরি করেছিল তাদের রংদানি।
মায়রতৌরি	যারা রান্নার কাজে নিযুক্ত ছিল।
দাহরী	যারা দাহরী নামক ছোট ছোট বাঁশ হাতে কালো চিল শকুন, কুকুর তাড়াচ্ছিল তারা দাহরী।
চুঙ্গা	যারা খাদ্য পরিবেশনের জন্য বাঁশ হাতে কেটে চোঙা তৈরি করেছিল তাদের 'চোঙা'(চুঙ্গা)।
বিটলীয়া	যারা নৃত্য ও তাম্বুল-পান পরিবেশন ও হাস্য রসাত্বক কথা বলে বা উদ্ভট অঙ্গভঙ্গি করে লোকদের মনোরঞ্জন করেছিল তাদের বিটলীয়া।
টোট্‌লা ও হানা	যারা পূজার উৎসব করার জন্য হাস-মুরগি,পাঠা-শূকর ইত্যাদির টুটি কেটে (গোলার সামনের দিকে) আর যারা অস্ত্র হেনে সেসব জীব হত্যা করে ছিল, তাদের যথাক্রমে টোট্‌লা ও হানা রাভা নামে নামে পরিচিত।[৭]

কোচ রাভাদের উৎস সম্পর্কে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন যে 'কম্বোজ' থেকেই এর উৎস। তবে এছাড়াও চুঙা, টোট্‌না, হানা নামে রাভাদের আরও কয়েকটি ছোট ছোট জনগোষ্ঠী আছে। রাভাদের এই গোষ্ঠীগত বিভাজন সম্পর্কে একটি কিংবাদন্তিও প্রচলিত আছে। যেখানে রাভাদের কর্মজীবনের মধ্যে দিয়ে নামকরণের বিষয়টিও উঠে এসেছে। কিংবদন্তি অনুসারে রাভাদের একজন দলপতি দদান রাজ্য লাভের আশায়, গোয়ালপাড়া জেলার আঠিয়া বাড়িতে একটি বিশাল উৎসবের আয়োজন করেছিলে আর এই উৎসবকে কেন্দ্র করেই সৃষ্টি হয়েছিল শ্রেণি বিভাজন। রাভা উপগোষ্ঠীগুলির কাজের বিভিন্ন ভাগ ছিল। কাজের ভাগের নিরিখে এই উপভাগগুলির জন্ম হয়। কাজের ভাগগুলি ছিল সাধারণত পূজা দেওয়া, খাদ্য তৈরি করা, চকৎ প্রস্তুত করা, এবং খাদ্য পরিবেশন করা।

পশ্চিমবঙ্গের রাভা উপজাতির অধিকাংশই কোচ-রাভা গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত এবং তাদের আরেকটা বিরাট অংশকে আসামের গোয়ালপাড়ার বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে খুঁজে পাওয়া যায়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আসাম ও উত্তরবঙ্গের রাভা জনজাতির মানুষের মধ্যে ধর্মান্তরিত হতে দেখা যাচ্ছে। হিন্দু রাভা থেকে খ্রিষ্টধর্মে ধর্মান্তরিত হচ্ছে। বস্তুত তাদের সমাজ ব্যবস্থায় কিছু রীতি-নীতি প্রচলিত থাকায়

জমির উপর রাভা নারীই অধিকার ছিল। আলিপুরদুয়ার জেলার রাভা বসতি অঞ্চলগুলিতে ক্ষেত্রসমীক্ষা করতে গিয়ে জানতে পারি যে রাভা পুরুষের কাছে নারী ও জমি সমার্থক। নারী হারালে তাদের জমির অধিকারেও টান পরে এবং ক্ষেত্রসমীক্ষা উঠে এসেছে এই জেলার অনেক রাভা পরিবার হিন্দুধর্ম থেকে খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করছে।[৮] এর থেকে স্পষ্ট প্রমাণ হয় যে রাভা জাতির জাতিসত্ত্বা বিপন্নতার পিছনে যে মূল কারণ ছিল তা হল ধর্মান্তরিকরণ। এই কারণে উত্তরবঙ্গের রাভা সম্প্রদায়ের সংস্কৃতিও বিপন্নতার পথে।

আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার জেলার কোচ ও রাভা জনজাতির মানুষেরা তাদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক ধারা এখনও কিছুটা বজায় রাখতে পারলেও বিটলিয়া, তেতলা, হেনা, রংদানি প্রভৃতি রাভা উপশাখার সংস্কৃতি প্রতিবেশি অন্যান্য সম্প্রদায়ের সংস্কৃতির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছে। আসাম অঞ্চলের 'পাতি' রাভাদের দিকে তাকালেই দেখা যাবে তারা তাদের ভোটবর্মী ভাষার পরিবর্তে বাংলা বা অসমিয়া ভাষা ব্যবহার করে। অন্য ভাষা গ্রহণ করায় কারণেই তাদের সামাজিক রীতিনীতির পরিবর্তন ঘটেছে। একই কারণে উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বসবাসকারী রাভা সমাজের তরুণ সম্প্রদায় নিজেদের ভাষায় কথা বলতে অনভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। উত্তরবঙ্গের এই প্রাচীন জনজাতির মধ্যে বর্তমানে চলছে অস্তিত্বের রক্ষার লড়াই। রাভাদের ভাষা, শব্দ, উচ্চারণ সংস্কৃতি, ধর্ম হারিয়ে যেতে বসেছে। একসময় তারা ঘর থেকে বের হতেন না, ঘরের মধ্যেই দিন কাটত। বাইরে লোক জঙ্গলে এলে তারা ঘরের মধ্যেই মুখ লুকাতেন। তবে বর্তমানে বিভিন্ন সরকারি কর্মসূচি ও বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের উদ্যোগে, বিশেষ করে বিশ্বায়ন ও আধুনিক ডিজিটালাইজেশনের ফলে তাদের মধ্যে অনেক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। উত্তরবঙ্গের প্রাচীন নৃগোষ্ঠী হিসাবে রাভারা এখন নতুন পথের পথিক। উত্তরবঙ্গের তরাই-ডুয়ার্সে প্রায় ৩০টি জনগোষ্ঠীর মানুষ বাস করে। প্রত্যেকটি জনজাতি তারা তাদের নিজস্ব স্বতন্ত্রতা নিয়ে বেঁচে থাকলেও সভ্যতার অগ্রগতির চাহিদার কাছে প্রয়োজনহীন বিষয়গুলি তাদের সমাজ থেকে ক্রমশই হারিয়ে যাচ্ছে। এরা আসাম থেকে উত্তর বাংলায় বিস্তৃত। উত্তরবঙ্গের আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসবাস করছে।

১৯৬১ সালের আদমশুমারি অনুসারে পশ্চিমবঙ্গে রাভা জনজাতির সংখ্যা

জেলা	জনসংখ্যা
জলপাইগুড়ি	৪১৩২ জন।

কোচবিহার	১৬০৮ জন।
অন্যান্য জেলা	৩১৩ জন।[৯]

বাসস্থান ও ঘরবাড়ি

আলিপুরদুয়ার জেলার শালকুমারহাট, কালচিনি, কুমারগ্রাম অঞ্চলে রাভা জনজাতির উপর ক্ষেত্রসমীক্ষা করতে গিয়ে সেই অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষজন এবং সেই এলাকা সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করি। সেই অভিজ্ঞতা থেকে রাভা জনজাতির বাসস্থান ও ঘরবাড়ি সম্পর্কে নিম্নরূপ বর্ণনা পাই। জঙ্গলের ধারে কিংবা লোকালয় থেকে বেশ কিছু দূরে সাধারণত আমরা রাভা গ্রাম বা বস্তি দেখতে পাই। অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষের সঙ্গে সাধারণত মেলামেশা করতে দেখা যায় না। জঙ্গলের স্থলকেই আশ্রয় করে ঘর-বাড়ি তৈরি করেছে। ক্ষেত্রসমীক্ষায় প্রত্যক্ষ করেছি বেশির ভাগ বাড়ি কাঠ দিয়ে তৈরি এবং তারা নিজেরাই ঘর তৈরি করত। প্রাচীন কাল থেকে রাভা জনজাতির মানুষের বাড়ি ঘরের আদল অন্যান্য সম্প্রদায়ের থেকে আলাদা বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

তারা ঘর বানানোর উপকরণ বন-জঙ্গল থেকে সংগ্রহ করত। একসময় তারা বনে-জঙ্গলে গিয়ে গাছ কেটে এনে সেই গাছ থেকে কাঠ বানিয়ে ঘর বানাত। বন থেকে সংগ্রহ করা কাঠ দিয়েই তাদের ঘরের দরজা বানাত। কিন্তু এখন বন্য আইন কঠোর হওয়ার গাছ কাটার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে, তাই এখন রাভা বস্তিগুলিতে কাঠের ঘর তেমন দেখা যায় না। বেশির ভাগ বাড়ি টিনের এবং কিছু কিছু বাড়ি কাঠের রয়েছে। তবে একসময় তারা যেহেতু বনাঞ্চল এলাকার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে থাকত সেহেতু তারা খুব সহজে কাঠের ঘরবাড়ি বানাতে পারত। তাদের থাকার ঘর বেশ ভাল হয় এবং যে ঘরে থাকে সে ঘরগুলি মাটি থেকে ১০ ফুট উচু হয় আর থাকার ঘরে কাঠের সিঁড়ি তৈরি করে। ঘরগুলো এমন ভাবে তৈরি করা হয় যার নিচের অংশ ফাঁকা রেখে উপর তলকে রাত্রি বাসযোগ্য করে গড়ে তোলে।[১০]

এই বাসযোগ্য ঘরগুলি আয়তনে অনেক বড় হয় এবং পাঁচ-ছয়টি কোঠায় ভাগ করা হয়। এই ঘরের ভিতরে গোটা পরিবার বাস করে। শালকুমারহাট অঞ্চলের রাভা বস্তিগুলি জলদাপাড়া অভয়ারণ্য পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে হওয়ায় হাতির আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বাড়িগুলি মাটি থেকে ১০ ফুট থেকে ১২ ফুট উচু করে তৈরি করত। (আমার আলোচ্য গবেষণাপত্রের চিত্র পরিচয়

অংশে এই ঘরের ছবি রয়েছে) তবে কিছু রাভা পরিবারে ৭০ থেকে ১০০ গজ লম্বা দুটি পাটাতন করা ঘর তৈরি করর। রাভা ভাষায় তারা এই ঘরগুলিকে বলে 'নক্সা নগৌ'।[১১] একটিতে কিশোরী ও যুবতী মেয়েরা ও অপরটিতে কিশোর ও যুবকেরা রাত্রিবাস করে। এই ঘরের ভিতরেই তারা গল্পের আসর জমাত। সেখানে তারা তাঁতশিল্পের ব্যবহৃত যন্ত্র, খেলাধুলা, শিকার, নাচ-গান, মাছ ধরা ও শিকার করার অস্ত্রাদি রাখত। গৃহকর্মের প্রয়োজনীয় ডালি-কুলো ইত্যাদি তৈরি করা শিখতো। কিন্তু এখন আর এই ঘরগুলি এই গ্রামে দেখা যায় না।

ঘরের নিচের দিকের ফাঁকা অংশকে তারা অবসর সময় কাটানোর জন্য এবং আসবাবপত্র রাখার জন্য ব্যবহার করে। রাভা বস্তিগুলির কোনো কোনো পরিবারের রান্না ঘরগুলি টিনের তৈরি আবার কোনো পরিবারের রান্না ঘরগুলি নিচের দিকে টিন দিয়ে উপরের অংশটি কাঠ দিয়ে তৈরি। রান্না ঘরের মেঝে সাধারণত মাটির হয়। রান্না ঘরের মাঝখানে মাটির উনুনের ব্যবস্থা, কাঠের জ্বালানি, উনুনের পাশে মাটির একটি ঢিবি থাকে, সেখানে পূর্বপুরুষের উদ্দেশ্যে কোনো কিছু উৎসর্গ করা হয়। এই ঢিবির উপরে ভাতের হাঁড়ি রেখে ভাতের ফ্যান গড়ানো হয়। অর্থাৎ প্রতিটি বাড়িতে দারিদ্রতার ছাপ এখনও বর্তমান। রাভা পরিবারের প্রায় বাড়িতেই শূকর পালন করতে দেখা যায়। তাই শূকর পালনের জন্য প্রায় বাড়িতেই আলাদা করে ঘর বানানো হয়। ঘরগুলি কাঠ দিয়ে বানানো হয় ছোট ছোট করে।

উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বসবাসকারী বিশেষত চা-বাগান, কৃষি অঞ্চল, বনবস্তি অঞ্চলে বাসগৃহ নির্মানের পুরোনো রীতি কিছুটা থাকলেও বাড়ি তৈরির উপকরণ হিসেবে ইট, কাঠ, টিন, সিমেন্ট ইত্যাদির ব্যবহার দেখা যায় এবং একটি পরিবারেই এখন চারটি ঘর দেখা যায়। প্রতিটি বাড়ির নিকট জলের ব্যবস্থা আছে। সম্প্রতি গ্রামীণ এলাকাগুলিতে 'প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা'য় (গ্রামীণ) বাড়ি তৈরি করার ক্ষেত্রে এলাকা এবং জনজাতির উপর ভিত্তি করে বাড়ি তৈরির সুপারিশ করছে কেন্দ্র সরকার। রাজ্যভিত্তিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে এলাকাভিত্তিক বৈশিষ্ট্যও মাথায় রাখতে হয়েছে এই প্রকল্পে। ইট-সিমেন্ট ছাড়াও বাঁশ, কাঠ, পাথর, মাটি, টিন-সব ধরনের উপকরণ ব্যবহার করে বাড়ি তৈরির সুপারিশ করছে তারা। প্রকল্পটি চালু করার মূল উদ্দেশ্যই হল গ্রামের গৃহহীন এবং দরিদ্র পরিবারগুলির জন্য কাঁচা বাড়ির পরিবর্তে পাকা বাড়ির ব্যবস্থা করা। রাভাবস্তির অনেক পরিবার এই প্রকল্পের আওতায় এসেছে।

আসবাবপত্র

শালকুমারহাট অঞ্চলের রাভা পরিবারের ঘরে খুব একটা আসবাবপত্র দেখা যায় না। আসবাব পত্রের মধ্যে থাকে মাটির হাঁড়ি, কলসি, বড়ো জোর অ্যালুমিনিয়াম থালা বাটি। অন্যান্য আসবাব পত্রের মধ্যে ধান ভাঙ্গায় কাঠের উদ্‌খুল এছাড়া কোদাল, কুড়াল, কাস্তে, শাবল, হাতুড়ি, হাতি তাড়ানোর জন্য বড়ো বড়ো লোহার রড। যে রডের মাথায় তারা আগুন লাগায় যাতে হাতি সহজে পালিয়ে যায়। তাদের ব্যবহৃত অস্ত্রগুলো তাদের ভাষায় যে নামে পরিচিত।

রাভা ভাষায়	বাংলা ভাষায়
পানতাম	দা
কিনচি	কাঁচি
পাটলাই	তরকারি রাঁধার হাঁড়ি
ডাবড়	বড়ো কলসি
টংককর	মদের হাঁড়ি
লঙখর	শূল
ঘূটওয়া	ঘট
খীম্বাই	কলসি[১২]

বন্যপ্রাণীদের আক্রমণের বিরুদ্ধে নিজেদের আশ্রয় খুঁজে নিতে, নিজেদের নিরাপত্তার প্রশ্নে প্রাচীনকালের রাভারা সবসময় অস্ত্রশস্ত্র রাখতে বাধ্য হত। এই সকল অস্ত্র তৈরি হত লোহা তামা ও সীসা দিয়ে এবং অস্ত্রের মাথায় সাপের বিষ লাগিয়ে এই অস্ত্রগুলি কার্যক্ষেত্রে ব্যবহার করত। এরা শিকারে যেমন পারদর্শী তেমনি এরা দক্ষ ছিল গোষ্ঠী যুদ্ধে।

পরিধেয় বস্ত্র ও অলংকার

পোশাক-পরিচ্ছেদ তাদের খুব কম। রাভা রমণীগণ প্রাচীনকাল থেকে নিজ হাতে সুতো কেটে কাপড় ও বস্ত্র তৈরি করে। রাভা জনজাতির মানুষেরা পোশাক-পরিচ্ছেদ নিয়ে প্রাচীন কাল থেকে আজ পর্যন্ত সম্পূর্ণ স্বনির্ভর। এই জনজাতির মানুষেরা প্রাচীনকাল থেকেই কার্পাসের চাষ করত।

কার্পাস তুলো দিয়ে তাদের ব্যবহৃত বিভিন্ন পোশাক তৈরি করত। এই সুতো দিয়ে তৈরি করত ‘কাম্বাং’ ও ‘লৌফুন’ অর্থাৎ মহিলাদের গোপনাঙ্গ নিবারণের আবরণ। তাদের সমাজে প্রায় বাড়িতেই নিজস্ব তাঁত শিল্প ছিল। মহিলারা তাদের প্রয়োজনীয় পোশাক নিজেরাই তৈরি করত। সুদর্শন ও বর্ণাঢ্য ‘কাম্বাং’ ‘লৌফুন’ তৈরি করে পাঁচ-ছয় জন রাভা মহিলা রাষ্ট্রপতি পুরস্কার লাভ করেছেন। যে কাপড় দিয়ে স্ত্রী লোকেরা মাথার খোপা ঢেকে রাখে তাকে বলা হয় খাদাবাং বা ফীণ্ডু। আর পুরুষেরা মাথায় ব্যবহৃত কাপড় হিসাবে ফালি বা চেংকানেন ব্যবহার করেন।[১৩]

রাভা বস্তিগুলিতে এক সময় কার্পাস তুলোর চাষ হত। সেই তুলো দিয়ে তারা শীতকালের বস্ত্র তৈরি করত। শীতকালে তারা একধরনের চাদর ব্যবহার করত তাদের ভাষায় তা ‘পানার’ বা ‘পাচ্‌রা’ বলে পরিচিত। কিন্তু এখন কার্পাস আর দেখা যায় না এই অঞ্চলগুলিতে। আলিপুরদুয়ার জেলার রাভা বস্তিগুলির পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে রাজবংশী সমাজের আধিপত্য থাকায় রাজবংশী সমাজের পোশাক পরিচ্ছেদের সাথে তাদের পোশাক পরিচ্ছেদের অনেকটা সাদৃশ্য বর্তমানে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে। এছাড়াও রাভা বস্তিগুলিতে গুটিপোকার চাষ হত। গুটিপোকা থেকে উৎপন্ন সুতো দিয়ে তারা শাড়ি, ব্লাউজ, বানাত। বিভিন্ন গাছের ফল, গাছের ছালকে তারা রং হিসেবে ব্যবহার করে। স্ত্রী লোকদের কাপড় থাকত আয়তনে আড়াই হাত চওড়া এবং চার হাত লম্বা। তাদের ভাষায় পরিধেয় কাপড়ের নাম হল রিফান বা রুপান, কোনো কোনো অঞ্চলে আবার খাম্বাংও বলা হয়। স্ত্রী লোকেরা মাথায় যে কাপড় দিয়ে খোপা ঢেকে রেখে জমিতে কাজ করতে যায় তাদের ভাষায় সেই কাপড়ের নাম হল ‘খদাবাং’।[১৪]

এই কাপড়টি আয়তনে লম্বায় তিন হাত এবং চওড়ায় এক হাত হয়। রাভা পুরুষেরা দিনের বেশিরভাগ সময়ই গামছা পরে থাকে। গামছাকে তারা নেংটি হিসাবে ব্যবহার করত। এই গামছাকে তাদের ভাষায় বলা হয় পাজাল, এটি লম্বায় চার হাত থেকে পাঁচ হয় এবং চওড়ায় এক হাত হয়। এমনকি রাভা রমণীদেরও দিনের বেশির ভাগ সময়ই ‘পাজাল’ পরতে দেখা যায়। পুরুষেরা কর্মক্ষেত্রে যাওয়ার সময় মাথায় একধরনের কাপড় পরে সেই কাপড়কে তাদের ভাষায় খসনে বা খোপং বলে। রাভা বস্তিগুলি বনাঞ্চল এলাকায় হওয়ায়, নিত্যদিনের প্রয়োজনে জঙ্গলে পশুশিকার বা কাঠ সংগ্রহ করার জন্য বনে যেত হত, বনে যাওয়ার সময় তারা একধরনের কাপড় কোমরে বাঁধত যা তাদের ভাষায় ফালি বা চেং কানেন বলে পরিচিত। বর্তমানে তাদের সমাজেও পোশাক-পরিচ্ছেদ অনেক পরিবর্তন এসেছে।

রাভা পরিবারগুলিতে অভাব অনটন সারা বছর লেগে থাকে। রাভা মহিলাদের গায়ে সোনার তেমন অলংকার দেখা না গেলেও রুপো, কাচ, প্লাস্টিকের অলংকার তারা ব্যবহার করেন। তবে আনন্দ উৎসবের দিনে তারা কিছু অলংকার পরে, তাদের ভাষায় সেই সব অলংকার বিভিন্ন নামে পরিচিত। তাদের ব্যবহৃত কিছু অলংকারের নাম তাদের সাথে কথোপকথনের মাধ্যমে জানতে পারি যেমন 'নামব্রি, বা 'মুদকর', কানের উপরের অংশে পরে 'বোলা-নামব্রি' রাভা রমণী অনেকেই নাক ফুটো করে। নাকে ব্যবহৃত অলংকার 'নাকাপাত' বা 'নুকুমপার' বলে পরিচিত।[১৫] হাতে কঙ্কন হিসেবে পরে 'স্যান', গলার পরে রূপোর তৈরি 'হাঞ্চা'। কোমরে পরে হাতির দাঁতের তৈরি মালা 'রুবক' বা 'লবক' আঙ্গুলে পরে 'ছিশিতাম'। রাভা পুরুষদের গায়ে সাধারনত তেমন কোনো অলংকার দেখা যায় না। হাতের আঙ্গুলে আংটি ছাড়া অন্য কোনো অলংকার দেখা যায় না। উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ রাভা অঞ্চলগুলির কিছু সংখ্যক খ্রিষ্টধর্মে গ্রহণ করা রাভা ছাড়া রাভা জনজাতির সকল শাখার নারীরাই কপালে সিঁদুর, হাতে শাঁখা পরে। রাভা মহিলাদের সাথে কথা বলে জানতে পেরেছি ঐতিহ্যপূর্ণ অলংকার হল 'লবগ'। তবে এখন আর এই অলংকার দেখা যায় না তার পরিবর্তে প্লাস্টিকের তৈরি 'লবগ' পাওয়া যায়।

শিক্ষা সমস্যা

আলিপুরদুয়ার জেলার রাভা জনবসতি অঞ্চলগুলিতে শিক্ষার হার খুবই নগণ্য। সাক্ষরতার বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া সত্ত্বেও সাক্ষরতার বৃদ্ধির হার আজও তেমন চোখে পড়ে না। উচ্চশিক্ষিত রাভা সংখ্যা খুবই কম। উত্তরবঙ্গের অন্যান্য উপজাতির মত রাভা সম্প্রদায়ের মানুষেরা শিক্ষাসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে অনেক পিছিয়ে আছে। বিশেষ করে শিক্ষার ক্ষেত্রে রাভা সম্প্রদায়ের মানুষদের একবিংশ শতাব্দীতেও অগ্রগতির তেমন কোনো লক্ষণ দেখা যায়নি। উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ বনাঞ্চলগুলিতে রাভা জনজাতির মানুষের বাস, বিশেষত জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলগুলিতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা রাভা জনজাতির মানুষের সার্বিক বিকাশ তেমন চোখে পড়ে না। এইসব অঞ্চলের জনজাতির মানুষেরা সাধারণত চা শ্রমিক, কৃষক শ্রমিক, বনশ্রমিক হিসেবে জীবিকা নির্বাহ করে। এই সম্প্রদায়ের মানুষেরা শুধু চা-বাগান অঞ্চল নয়, কৃষিকাজের সঙ্গে পশু পালন করে আসছে। চা-শ্রমিকের কাজে অল্প মজুরি পেয়ে অতিকষ্টে কোনো প্রকারে দিনযাপন করে আসছে এই সম্প্রদায়ের মানুষেরা। বনশ্রমিকেরা সারা বছরে খুব অল্প দিন শ্রমিকের কাজ

পায়। বাকি সময় তারা বাইরে মজুরি খাটে, অনেকে পশুপালন করে, অল্প জমিতে সব্জিচাষ করে অতিকষ্টে দিন যাপন করছে। অতীব অর্থসংকটের কারণেই তাদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার বিষয়ে তেমন মনোযোগ দিতে পারেনি। ছেলে মেয়েদের উপযুক্ত শিক্ষাদানের ক্ষমতা অভিভাবকদের ছিল না। বেঁচে থাকার তাগিদে সারাদিন কঠোর পরিশ্রম করে কোনোক্রমে দিন অতিবাহিত করত।

পড়াশোনার বিষয়ে একসময় তেমন কোনো আগ্রহ দেখা যেত না এইসব জনজাতির মানুষের মধ্যেও। মূলত অর্থনৈতিক প্রতিবন্ধকতাই শিক্ষাক্ষেত্রে এই সম্প্রদায়ের পিছিয়ে পড়ার একটা বড় কারণ বলে মনে করেন শিক্ষাবিদরা। আদিবাসী উন্নয়ন পরিকল্পনায় এইসব অঞ্চলগুলিতে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হলেও মূলত ভাষা একটা সমস্যা রয়েই যায়। বিদ্যালয়ে মাতৃভাষায় পড়ার সুযোগ প্রায় নেই বললেই চলে। বর্তমান সময়ে এই অবস্থার সামান্য পরিবর্তন হলেও আর্থিক দিক থেকে তেমন অগ্রগতি বা শিক্ষার দিক থেকে তেমন অগ্রগতি হয়েছে এমন বলা চলে না। ২০১১ সালের জনগণনার রিপোর্ট অনুসারে দেখা যায় যে প্রায় এগারো কোটি আদিবাসী জনজাতি সম্প্রদায়ের মানুষ ভারতবর্ষে বসবাস করেন। অর্থাৎ ভারতবর্ষের মোট জনসংখ্যার ৮.৬ শতাংশ এবং পশ্চিমবঙ্গের মোট জনসংখ্যার ৫.১ শতাংশ আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ বসবাস করে। এদের মধ্যে কিছু শতাংশ মানুষ সামান্য একটু উন্নতি লাভ করলেও একটা বড় অংশ আদিম অনুন্নত জীবন যাপন করে আসছে। বেঁচে থাকার জন্য দৈনন্দিন সংগ্রাম করে জীবন নির্বাহ করতে হয় আর সেই কারণেই আধুনিক শিক্ষার ক্ষেত্রে এরাই ভারতের সবচেয়ে অনগ্রসর সমাজ।[১৬]

তবে সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলনে ফলে রাভা শিক্ষা ব্যবস্থায় কিছুটা হলেও উন্নতি হয়েছে। শুধু শিক্ষাই নয় সাক্ষরতা (Literacy) বলতে যা বোঝায় এদের মধ্যে অতি স্বল্প শতাংশ। কোনো কোনো পরিবারের অনেক ছেলে মেয়ে এখন স্নাতক-স্নাতকোত্তর পাস করেছে। প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় রাভা গ্রামগুলিতে গড়ে উঠেছে। বর্তমানে এই অঞ্চলে রাভা পরিবারের অনেক ছেলে মেয়ে উত্তরবঙ্গ, পঞ্চাননবর্মা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিভিন্ন বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেছে।

ডুয়ার্স এবং তরাই এর বিস্তীর্ণ চা-বাগানে চা শ্রমিক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করলেও দীর্ঘ সময় অতিক্রম করে বর্তমান সময়ে সংখ্যায় তেমন উল্লেখযোগ্য না হলেও প্রশাসনিক আধিকারিক

হিসেবেও দু-একজন এই অঞ্চলের রাভা সম্প্রদায়ের মানুষ সৈন্যবাহিনী, পুলিশ বিভাগ, শিক্ষক, পঞ্চায়েতের বিভিন্ন দপ্তরসহ সরকারি-বেসরকারি বিভাগে কর্মরত। তবে এই অঞ্চলের বেশির ভাগ রাভা জনজাতির মানুষেরই সাক্ষরতার জ্ঞানটুকুও নেই। রাভা সম্প্রদায়ের যে সমস্ত মানুষ এই সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলনে সামিল হয়ে অক্ষর জ্ঞান লাভ করেছে, যদিও তার সংখ্যা উল্লেখযোগ্য নয়। অক্ষরজ্ঞানের পরবর্তী পর্যায়ে দৈনন্দিন জীবনে তার কোনো ব্যবহারের সুযোগ নেই এই অঞ্চলগুলিতে। ফলে অক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন হয়ে যারা টিপসই এর বদলে কোনোক্রমে স্বাক্ষর হয়েছিল কিছুদিনের মধ্যেই তা তারা ভুলে গেছে।

বনাঞ্চলে বন্য জীবজন্তুর সঙ্গে কঠিন লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে এই সম্প্রদায়ের মানুষেরা নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পেরেছে। রাভা বস্তিগুলিতে শিক্ষার প্রসার না হওয়ায় মানসিক দিক থেকে তারা অনেকটাই পিছিয়ে পড়েছে। তবে বর্তমানে শিক্ষা বিস্তারের ফলস্বরূপ রাভা জনজাতির ব্যক্তিবর্গের দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে। শিক্ষিত অংশের মধ্যে দেখা দিয়েছে পিতৃ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার আপ্রাণ চেষ্টা। তাদের গোত্র মায়ের দিক থেকে নয় নির্ধারিত হবে পিতার দিক থেকেই। তবে এখনও এই সম্প্রদায়ের অধিকাংশ মানুষেরা অশিক্ষা, অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার প্রভৃতি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত নয়।

পেশা

সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে রাভা গ্রামে কর্ম চাঞ্চল্যের সাড়া পড়ে যায়। কেউ যায় বনে কাঠ কুড়াতে, কেউ শিকার করতে। সারাদিন পরিশ্রমের অবসন্ন হয়ে তারা ফিরে আসে নিজ নিজ বাড়িতে। যেদিন আহার জুটে সেদিন সবাই মিলে ভাগ করে খায়। যেদিন জুটে না সেদিন অর্ধ-উপবাস বললেই চলে। তাই পুরুষের সমান মহিলাদের ও পরিশ্রম করতে দেখা যায়। আলিপুরদুয়ার জেলার অধিকাংশ রাভা সমাজের মানুষ কৃষি নির্ভর। কৃষি নির্ভর অর্থনীতি হওয়ায় রাভা সমাজের মানুষেরা পূর্বকাল থেকেই পারদর্শী হয়ে ওঠে। জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহারের রাভা জনজাতিকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে, একটি গ্রামীণ রাভা সমাজ, অপরটি অরণ্যবাসী রাভা সমাজ। অরণ্যবাসী রাভারা বনদপ্তর-এ নিয়োজিত শ্রমিকের কাজে যুক্ত। এরা প্রত্যেক পরিবার চাষবাসের জন্যে দু-একর জমি পায়।

সেই সঙ্গে তাদের বাড়িঘর তৈরি করে দেওয়া হয়। জীবিকার প্রয়োজনে তারা হাঁস, মুরগি, ছাগল, ভেড়া, শূকর, গরু, মোষ, পালন করে। জীবিকার প্রয়োজনে রাভা মহিলারা পোশাক প্রস্তুত করে বিক্রি করত। রাভা সমাজের অনেকে বাদ্যযন্ত্র বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করে। তবে বর্তমানে তারা কৃষিকাজকেই পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছে। কৃষিকাজ এই সমাজের বর্তমান ভিত্তি। রাভা জনজাতির মানুষেরা জমিকে গুরুত্ব দিয়ে এসেছে অতীতকাল থেকেই। রাভা পরিবারের রমণীদের হাতেই জমি রক্ষনাবেক্ষনের দায়িত্ব থাকত। একসময় জমি চাষ থেকে শুরু করে ফসল ফলানোর দায়িত্বে ছিল রাভা মহিলারাই। রাভা সমাজে একসময় পুরুষের চেয়ে রমণীদের প্রাধান্য ছিল বেশি।[১৭]

তাই সংসার পরিচালনার ক্ষেত্রে নারীদেরই মুখ্য ভূমিকা ছিল। উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা রাভা পরিবারগুলির দৈনন্দিন আয় খুবই কম, জীবন সংগ্রামের লড়াইয়ে বেছে নিয়েছে চা শ্রমিকের দিনমজুরির কাজ। এই ভাবে চা-শ্রমিক, বনশ্রমিক, এবং কৃষিজীবী হিসেবে শুরু হয় তাদের নতুন অর্থনীতির অধ্যায়ের। তবে সামগ্রিক ভাবে কঠোর পরিশ্রমের অভ্যস্ত তরাই ও ডুয়ার্স অঞ্চলের রাভা সমাজের মানুষেরা চা-বাগান, কৃষি অঞ্চল, এবং বনবসতি অঞ্চলে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে নতুন ভাবে বেঁচে থাকার লড়াইয়ে তারা খুবই আশাবাদী এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

বর্তমানে এই অঞ্চলের রাভা সম্প্রদায়ের মানুষেরা উত্তর-পূর্ব ভারতের অন্যান্য রাজ্যের জনজাতিদের মতোই কৃষিকর্মকেই জীবিকার্জনের একমাত্র উপায় হিসেবে গ্রহণ করেছে। রাভাদের লোকগীতি, লোককাহিনি ও লোকনৃত্যে তাদের কৃষিকাজের বর্ণনা পাওয়া যায়। মহিলারাই কোদাল, খন্তা ইত্যাদি ব্যবহার করে প্রথমে কৃষিকাজ শুরু করে। কেননা রাভা সম্প্রদায়ের মানুষের সাথে প্রকৃতি এবং জঙ্গলের একটা নিবিড় ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। তবে বেশ কিছু বছর আগে জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার জেলার তরাই, ডুয়ার্সের জঙ্গলগুলোকে সংরক্ষিত বনাঞ্চল বলে ঘোষণা করার সাথে সাথেই রাভাদের এই জীবন ধারার পরিবর্তন শুরু হল। বন থেকে বিতাড়িত হলেন রাভারা। তবে কিছু সংখ্যক রাভা পরিবারেরে ছেলেদের বনরক্ষার কাছে বনকর্মী পদে নিযুক্ত করা হয়েছে। তবে বেশির ভাগ মানুষই বাধ্য হয়ে বেছে নিতে হয় কৃষিকাজ। দীর্ঘদিন ধরে কৃষিকাজেই ছিল তাদের পেশা। লাঙ্গলের সাহায্যে কৃষিকাজ তাদের ছিল অজানা।

তবে রাভা পরিবারের রমণীরা তাঁত শিল্পের সাথে যুক্ত ছিল, তাদের তৈরি তাঁত শিল্পের গুণগত মান খুবই ভালো থাকায় রাজ্যের বাইরেও জনপ্রিয়তা ছিল। এই জেলার রাভা সমাজের কিছু শতাংশ মানুষ দীর্ঘদিন ধরে তাঁত বুনেই জীবনযাপন করে আসছিলেন।[১৮] আলিপুরদুয়ার জেলায় বসবাসকারী রাভা জনজাতির অনেকেই আদিমকাল থেকেই পেশা হিসেবে মাছচাষকে বেছে নিয়েছে তাদের জনজীবনে। টাটকা মাছ তো বটেই মাছ শুকিয়ে দীর্ঘদিন সংরক্ষণের কৌশলও রপ্ত রয়েছে রাভাদের। কিন্তু সময়ের সাথে পাল্টে গেছে নতুন প্রজন্মের চাহিদা। জীবন লড়াইয়ের তাগিদে বেছে নিয়েছে ভিন্ন পথ। কেউবা কর্মসূত্রে অন্য রাজ্যে পাড়ি দিয়েছে, কেউবা রাজমিস্ত্রির কাজে যুক্ত হয়েছে। আলিপুরদুয়ার জেলার শালকুমারহাট, কালচিনি, কুমারগ্রাম, কামাখ্যাগুড়ি, এলাকার রাভা জনজাতির মানুষেরা সমতল ভূমিতে বসবাস করায় রাজবংশী সম্প্রদায়ের মানুষের সাথে তাদের একটা সান্নিধ্য গড়ে উঠেছে। ফলে রাজবংশী সমাজের বেঁচে থাকার লড়াইয়ের সাথে তারাও যেন একাত্ম হয়ে উঠেছে।

বাদ্যযন্ত্র

একসময় রাভাদের মধ্যে অল্প স্বল্প কয়েকটি বাদ্যযন্ত্র ছিল কিন্তু সময়ের সাথে সাথে তারা বাদ্যযন্ত্র নিজেরাই তৈরি করে নেয়। পরবর্তীতে তারা ব্যবহারিক জীবনের প্রয়োজনে বিভিন্ন প্রকার বাদ্যযন্ত্র তৈরি করতে বাধ্য হয়। তাদের ভাষা অনুযায়ী বাদ্যযন্ত্রের নাম ও ব্যবহার ছকের সাহায্যে দেখানো হল -

হেম	এক প্রকার ঢোল; আড়াই ফুট লম্বা ও দুই ফুট ব্যাস যুক্ত কাঠের খোলে ছাগলের ছাউনি দিয়ে এই ঢোল তৈরি করা হয়।
ঝাপখাবা	এটা এক ধরনের বাঁশি, বাঁশের চোঙ্গা জোড়া দিয়ে তৈরি করা হয়। আয়তনে অনেকটা লম্বা হয়।
শিঙা	নৃত্যগীত ছাড়াও মাছ মারার সময় এই শিঙা বাজানো হয়। এটি মোষের শিং দিয়ে তৈরি।
গুগুমেল	এটি মাটি দিয়ে তৈরি করে আগুনে পোড়ানো হয়। ভৈপুর বাদ্যযন্ত্র।
দায়রি	কাঁসা দিয়ে তৈরি অনেকটা করতালের মতো।

খাম	এটা হল এক প্রকার লম্বা ঢোল। এর আয়তন হিসেবে বলা যায় এক ফুট ব্যাস যুক্ত সাড়ে চার ফুট লম্বা গামারি গাছের কাঠ দিয়ে তৈরি। ছাউনির হয় ছাগলের চামড়া দিয়ে।
তারচা	ছয় থেকে আট ইঞ্চি লম্বা ও দু থেকে তিন ফুট ব্যাসযুক্ত কাঠের খোলে ছাগলের চামড়া দিয়ে ছাউনি বানিয়ে তৈরি করা হয়।
কাল বৌংশী	এটি এক ধরনের বাঁশি। এর সুর খুব করুণ হয় তাই রাভা সমাজে এই বাঁশির নাম কাল বাঁশি। বিশেষত শোক অনুষ্ঠানগুলিতেই এই বাঁশি বাজানো হয়।
খারা বৌংশী	নল বাঁশ দিয়ে এই বাঁশি তৈরি করা হয়। এই বাঁশি আয়তনে অনেক বড় হয়। সাধারণত ছয় থেকে আট ফুট লম্বা হয়।
দায়দি	কাঁসা দিয়ে তৈরি হয়। অনেকটা করতালের মত।
বুবুরিঙ্গা	এই বাদ্য যন্ত্রটি বাঁশের তৈরি। এটি রাভা সমাজে অনেক পুরানো বাদ্যযন্ত্র।
সপ্তস্বর বাঁশি	আনন্দ উৎসবগুলিতে রাভা সমাজে এই বাঁশির ব্যবহার বেশি দেখা যায়। এই বাঁশি থেকে মধু আওয়াজ বের হয়। তাই রাভা অঞ্চলে এই বাঁশি সপ্তস্বর বাঁশি নামে পরিচিত।[১৯]

রাভা ভাষার পরিচয়

রাভা জনজাতির ইতিহাস ঘাটলে দেখা যায় তাদের ভাষার নিজস্ব কোনো বর্ণমালা নেই। আজ পর্যন্ত তাদের কোনো লিখিত সাহিত্যেরও হদিশ পাওয়া যায়নি। ভাষাতাত্ত্বিকদের মতে বোড়ো-কাচারী, গারো-মেচ-ত্রিপুরী শাখা থেকে রাভা-ভাষার আগমন। তাদের ভাষার উৎপত্তি মূলত মানুষের লোকমুখে, লোককথায়, ছড়া, গীতিতে। প্রয়োজনের জন্য তারা অসমীয়া বর্ণমালাকে গ্রহণ করেছে। আসামের বসবাসকারী রাভা জনজাতির মানুষেরা শিক্ষা-দীক্ষার জন্য অসমীয়া বর্ণমালাকে বেছে নিয়েছে। কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার জেলাতে যে সকল রাভা জনগোষ্ঠী বাস করে তারা বাংলা ভাষাকে রপ্ত করেছে। ভাষা নিয়ে এই অঞ্চলের মানুষের মধ্যে কোন রকম চিন্তা করতে দেখা যায় না। উত্তরবঙ্গে বসবাসকারী রাভারা বাংলা ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেছে। ভাষাবিজ্ঞানীরা মনে করেন রাভা ভাষায় এমন কিছু শব্দ আছে যা তাদের নিজস্ব, তবে বেশিরভাগ ভাষাই অন্য ভাষার সংশ্রব থেকে এসেছে।

তবে তাদের ভাষার মধ্যে এমন কিছু শব্দ আছে যার উৎস আজও উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় রাভা ভাষার মূলগত বৈশিষ্ট্য দেখিয়েছেন নিম্নরূপ -

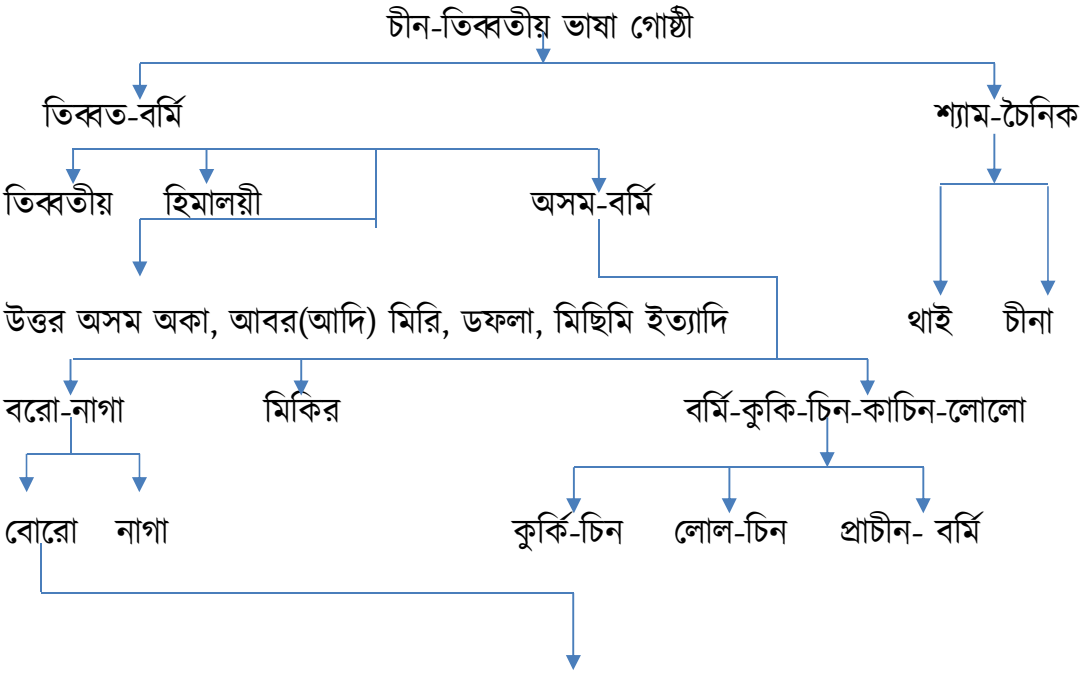

আলিপুরদুয়ার জেলার রাভা জনজাতির দৈনন্দিনের ব্যবহৃত কিছু শব্দ

আত্মীয়তাসূচক শব্দ		অঙ্গ-প্রতঙ্গ বিষয়ক শব্দ	
বাংলা	**রাভা**	**বাংলা**	**রাভা**
বাবা	আওয়া	মুখ	হোতং
মা	আমায়	নাক	নুকুং
ছেলে	সা	চোখ	মকর
মেয়ে	মিচিকসা	কান	নাচর
ভাগ্নে	বাংনায়	হাত	হাপকে
বড় বোন	জৌণ	বুক	হাপাক
শ্বশুর	হউ	চোয়াল	কায়তলক্
শাশুড়ি	নৈ	চামড়া	হলক্
ছোট ভাই	আজংপইমর	পিঠ	কুঞ্জর
জামাই	কিলাং	পা	চদুক
পিসি	মানি	গলা	তুকুর
নাতনি	ওয়াইসা	কাঁধ	ফাকরং

গণনা বিষয়ক সংখ্যার শব্দ		গণনা বিষয়ক সংখ্যার শব্দ	
বাংলা	**রাভা**	**বাংলা**	**রাভা**
এক	গ	ছয়	করোপ
দুই	আনিং	সাত	চিনিং
তিন	আতাম	আট	জু
চার	ব্র	নয়	চেত্
পাঁচ	বঙা	দশ	চি

খাদ্য দ্রব্য বিষয়ক শব্দ		গৃহস্থালি দ্রব্য বিষয়ক শব্দ	
বাংলা	**রাভা**	**বাংলা**	**রাভা**
ভাত	মায়	বিছানা	মনদইম
মাছ	না	বালিশ	হানদইম
চিড়া	রুনচুত্	উনুন	ফংকর
খই	পম ফ্রেত	খড়ি	বাপান
মাংস	কান	খুন্তি	মায়কন
তরকারি	মুই	হাঁড়ি	মতক
মদ	চকৎ	ঝাড়ু	পরসিং
দুধ	নন	কলসি	কম্বই
লবণ	শ্যম্	গাইন	মান্তারায়
শাক	পানচাক	ছাম	সাহাম
ধান	মায়	পিড়ি	ধাম[২১]

হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত শব্দ		অলংকার বিষয়ক কিছু শব্দ	
বাংলা	**রাভা**	**বাংলা**	**রাভা**
তলোয়ার	হানদা	কান-বালা	মের
বর্শা	খাগড়	গলার হার	তকম
কাস্তে	কাংকা	আংটি	চিসতাম
ধনু	ফ্যা	নাকফুল	নকুংগার
কুড়াল	বসিঙ্গ	হাঁসুলি	টাসুর

বিচার ব্যবস্থা

উত্তরবঙ্গে বসবাসকারী রাভা জনজাতির মানুষের বিচার ব্যবস্থার প্রতি তাদের পূর্ণ সমর্থন রয়েছে। সভ্য সমাজের কাছে রাভা সম্প্রদায়ের মানুষেরা আদিবাসী অসভ্য জাতি হিসেবে পরিচিত হলেও বর্তমানে একথা বলা যায় যে, তথাকথিত সভ্য সমাজের থেকে তারাই বেশি শৃঙ্খলাপরায়ণ সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। একসময় তাদের উৎশৃঙ্খল জাতি হিসেবে চিহ্নিত করা হত। সময়ের সাথে সাথে সেই চিন্তা ভাবনা মানুষের মন থেকে অনেকটাই মুছে গেছে। আমরা যদি তাদের বিচার ব্যবস্থার দিকে লক্ষ করি তাহলেই হয়ত সে চিন্তা ভাবনা কিছুটা হলেও দূর হবে।

উৎশৃঙ্খল রাভারা বর্তমানে শৃঙ্খলাপরায়ণ হয়ে উঠেছে। নিজেদের মধ্যে বিচার সভাই তাদের শৃঙ্খলাপরায়ণের মূল কারণ। এই বিচারসভার বাইরের কেউ কথা বলতে পারে না। কেউ যদি অপরাধী প্রমাণিত হয় তাহলে কঠোর শাস্তি বিধানের নিয়ম আছে। রাভা সমাজে এই বিচার সভার নাম হচ্ছে 'মারাপসন'। তাদের সমাজের যদি কোনো ব্যক্তি ঝগড়া, খুন, মারামারি, চুরি, বধূ নির্যাতন, নিজ গোত্রের মধ্যে বিয়ে, কিংবা অন্য কোনো সামাজিক অপরাধে অপরাধী হন, তাকে মিটিয়ে দেবার জন্য এবং কঠোর ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলাবোধ রাখতেই এই 'মারাপসন' বা বিচারসভা। এই বিচারসভায় গাঁয়ের মোড়ল বা বৃদ্ধ জ্ঞানী ব্যক্তিরা সবাই মিলে একসাথে বসে অপরাধীদের বিচার করে দণ্ড বিধান করেন। বিচার কর্তারা যে দণ্ডই দিন কেন তা মেনে চলতে বাধ্য। নর-নারীদের মধ্যে যদি কোনো অবৈধ সম্পর্ক স্থাপন হয়, সেই সম্পর্ক যদি বিচারসভায় সত্য প্রমাণিত হয় তাহলে বিচারসভায় অর্থ দণ্ড ধার্য করা হয়। প্রয়োজন মনে হলে সর্বসম্মতভাবে তাদের সমাজ থেকে বহিষ্কার করার ক্ষমতা এই বিচার সভার রয়েছে। অর্থাৎ সমাজকে শৃঙ্খলাবদ্ধ রাখতে এই মারাপসন বা বিচার সভার গুরুত্ব রাভা সমাজের কাছে ছিল সর্বাধিক। বনবসতি এলাকায় এখনও একজন করে গাঁ-বুড়ো বা 'তারাওপারে' রয়েছেন যিনি সামজিক ভালো মন্দের বিধান দেন। রাভা সমাজ এই 'তারাওপারে' কে যথাযথ সম্মান করে। তবে এখন তাদের বিচার সভায় গ্রাম প্রধান, পঞ্চায়েতকে ডাকা হয়।[২২]

গোত্র পরিচয়

রাভা জনজাতির মানুষের সাথে কথা বলে জানতে পেরেছি তাদের একসময় সাতশোর কাছাকাছি গোত্র ছিল। গোত্রের রীতি-নীতিগুলি তারা কঠোরভাবে মেনে চলত। গোত্রের মধ্যেই তাদের পরিচয় নিহিত থাকত। একসময় তাদের সমাজে একই গোত্রের মধ্যে বিবাহ কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ছিল। এমনকি মিত্র গোত্রের মধ্যেও একসময় বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল। রাভা সমাজে প্রায়ই দেখা যেত যে, একটি গোত্রের কেউ কোনো রকম অসুবিধার সম্মুখীন হলে বা কোনো রকম বিপদে পড়লে যদি অন্য গোত্রের কেউ তাদের সেই বিপদ থেকে উদ্ধার করে তাহলে তারা 'সৌরু হৌসুগ' বা মিত্র গোত্রের বন্ধনে আবদ্ধ হয়। তবে যে কোনো জনজাতীয় উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হিসেবে গোত্র আজও বিরাজমান। উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বিশেষত আলিপুরদুয়ার জেলায় বসবাসকারী রাভা সমাজ প্রাচীন ভাষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে গোত্র ধারাও হারিয়ে ফেলছে। আগে গোত্র এবং গোত্র প্রতীক সব অধিবাসীদের মধ্যে ছিল। এই গোত্রের প্রতীক সমূহ বেশির ভাগই গাছ, লতা, পশুপাখি, দ্বারা চিহ্নিত করত। নিম্নে তাদের সাথে কথোপকথনে উঠে আসা কিছু গোত্রের নাম ও গোত্র প্রতীক দেখানো হল -

গোত্র	**প্রতীক**
বান্দা	বেগুন
দারবত	লাউ
কামা	ইঁদুর
পমচিবক	শিশির
পমরৈ	দুরা
রোংগাও	শিমূল গাছ
চিনচেত	বক
মৌজি	বোয়াল মাছ
থুমুরি	ময়ূর
নেগিনাং	ভাটপাখি
কার গগক	বোয়াল মাছ[২৩]

রাভাদের ধর্ম

মানব সমাজে কিভাবে ধর্মের উৎপত্তি হয়েছিল তার প্রকৃত সন্ধান আমাদের সবার অজানা। ধর্মকে একটা সামাজিক উপাদান হিসেবে ধরা হয়। এই ধর্ম মানব ইতিহাসে কোন সনাতন বস্তু নয়। কেননা কোনো ধর্মীয় চেতনা নিয়ে মানুষ পৃথিবীতে আসেনি। রেবতীমোহন সাহা *রাভাদের লোককাহিনী* গ্রন্থে বলেছেন –"রাভাগণ প্রাচীন কাল থেকে সর্বপ্রাণবাদী। নানা লোকাচার ও সংস্কৃতির সঙ্গে বহু কুসংস্কার ও ভূত-প্রেত মিলিয়ে তাঁদের ধর্মবোধ বিচিত্র রূপ ধারণ করেছে। আর্যদের বহু দেব-দেবীও তাদের উপাস্য রূপে গৃহীত হয়েছে। কালিকা পুরাণ ও যোগিনীতন্ত্রম-এ শিবের কোচনি পাড়ায় গমন ইত্যাদি কাহিনী থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় ঋষিবায় নামে কিরাত শিবই তাদের প্রধান উপাস্য ও সৃষ্টিকর্তা রুপে পূজিত হয়। সম্প্রতি রাভাদের মধ্যে খ্রিষ্টধর্মে প্রচারের প্রচণ্ড প্রচেষ্টা চলছে এবং বেশ কিছু সংখ্যক রাভা ধর্মান্তরিত হয়েছে। অনেক স্থানে মিশনারি চার্চ তৈরি হয়েছে।"[২৪] আদিবাসী জনজাতিদের ধর্ম কি? এ বিষয়ে আজ পর্যন্ত কোনো সদুত্তর পাওয়া যায়নি। আদিবাসীদের ধর্ম নিয়ে ভারত সরকার যে রিপোর্ট পেশ করেছেন তাতে তারা 'আনিমিজম' শব্দটির আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। যার অর্থ হল সর্বপ্রাণবাদ। আরও ব্যাখ্যায় যেতে হলে আমাদের প্রথমেই জেনে নিতে হবে ধর্ম কি? এবং ধর্মের গোড়ার কথা। ধর্ম কথাটির মধ্যে আছে নানা ধরণের মানে। কিন্তু কথাটির আসল মানে হচ্ছে, যা করলে ভালো হয় বা যা করা উচিত এমন কাজ। যেমন অহিংসা পরম ধর্ম একথা বললে বোঝায় যে কারো হিংসা না করাই উচিত। মতের তফাৎ যাই হোক না কেন, প্রায় সব ধর্মের মোট কথা কিন্তু এক। তা হলো ভগবান বা দেবতারা আছেন ও তাদের খুশি করতে পারলে তবে মানুষের মঙ্গল হয়। মানুষের কিসে ভালো হবে কিসে মন্দ হবে সেটা বলাই ধর্মের আসল উদ্দেশ্য। সর্বপ্রাণবাদ দিয়ে ধর্মের আরম্ভ যে সব বুদ্ধিমান লোকেরা ভেবে বার করেছিল, তারাই হল পৃথিবীর প্রথম ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা। তারাই বলে দিত কি করলে মানুষ ভালো থাকতে পারে, এবং এ জন্য তাদের কি করা উচিত। তাই সর্বপ্রাণবাদ হলো পৃথিবীর সব চাইতে পুরোনো ধর্ম। কিন্তু আদিবাসীদের ধর্ম বিশ্বাসে এই আখ্যা দেওয়া মোটেও ঠিক নয়। আদিবাসীরা তাদের নিজস্ব উৎসব, পূজা পদ্ধতি ও বিশ্বাস নিয়ে আছেন। হিন্দু দেবদেবীর পূজা-পদ্ধতিও হিন্দু সুলভ ধর্মবিশ্বাসকেও তারা নিজের করে নিয়েছেন। তবে বলা যায় আদিবাসীদের পরিচয় আসলে 'অবনত হিন্দু' ছাড়া কিছুই নয়।

রাভা সম্প্রদায়ের মানুষের সাথে কথা বলে জানতে পেরেছি তাদের মধ্যে হিন্দু দেবদেবীর প্রতি অগাধ বিশ্বাস রয়েছে। রাভা সমাজে প্রচলিত দেব-দেবীর দুটি ভাগ দেখা যায়। একটি ভাগে দেখা যায়, যে সকল দেব দেবীর পূজা করলে পরিবার বা সমাজের মঙ্গল হয়। আরেকটি ভাগ যা অপদেবী বা অপদেবতা নামে পরিচিত। এই সকল অপদেবী মনুষ্য সমাজে সব সময় অনিষ্ট করে। পূজা না দিলে এই সকল অপদেবতা যে কোনো সময় তাদের ক্ষতি করতে পারে। মঙ্গলকারী দেবদেবীর তালিকায় আছে কামাখ্যা, ঋষি, জগ-মহাকাল, বলরাম, রনতুর বানেব, গাংরাজা, মিচিক রায়, নুর রায়। অপদেবতাগুলির মধ্যে বুলুয়া গন্চ, পাপিয়া, ভে-কাল, জৌরা-কাল, জোকা-জোকুনি প্রভৃতি। কিন্তু বর্তমানে উত্তরবঙ্গের রাভা জনজাতির মানুষেরা অল্প অল্প করে হিন্দুধর্ম থেকে খ্রিষ্টধর্মে ধর্মান্তরিত হচ্ছে।[২৫]

সুতরাং ঠিক কতখানি এবং কি পরিমাণে হিন্দুধর্ম বা খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করার পর রাভা জনজাতিকে হিন্দু বা খ্রিষ্টধর্ম বলা উচিত সে সম্বন্ধে কোনো একটা মাপ স্থির করা সম্ভব নয়।

উপসংহার

রাভা আসামের একটি জনজাতি হলেও জীবিকার প্রয়োজনেই তাদের কিছু সংখ্যক উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ সমতল ভূমিতে নেমে আসে। আসামের রাভা জনজাতির সাথে উত্তরবঙ্গের তিন জেলায় (জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার) বসবাসকারী রাভা জনগোষ্ঠীর অনেকটা বৈসাদৃশ্য রয়েছে। এইসব অঞ্চলের রাভাদের বাসস্থান, ঘর-বাড়ি, আসবাপত্র পোশাক-পরিচ্ছেদ অলংকার তাদের খাদ্যবস্তু, ভাষা ইত্যাদির দিকে তাকালে তা স্পষ্ট বোঝা যায়। উত্তরবঙ্গের ভৌগোলিক পরিবেশ এখানকার জনজাতির উপর প্রভাব বিস্তার করছে। এখানকার জনজাতি সমূহের শিক্ষা সাহিত্য, সভ্যতা সংস্কৃতি আচার আচরণ ভৌগোলিক পরিবেশ দ্বারা ভীষণভাবে প্রভাবিত। এই অঞ্চলের বেশির ভাগ জনজাতি সহজ সরল যেমন মানসিকভাবে তেমনি এদের জীবনযাপন পদ্ধতিও পরিবেশ নির্ভর সহজ সরল। উত্তরবঙ্গে বিভিন্ন জনজাতি দীর্ঘদিন ধরে পাশাপাশি বসবাস করার ফলে একে অপরের জীবনযাপন, সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান গ্রহণ করার ফলে এক মিশ্র সংস্কৃতির সৃষ্টি হয়েছে। বিভিন্ন জনজাতি সমূহের ভাষা, সংস্কৃতি আলাদা। তাদের আগমন ঘটেছে বিভিন্ন স্থান থেকে, কোনো জনগোষ্ঠী আসাম থেকে, কোনো জনগোষ্ঠী তিব্বত থেকে, কোনো

জনগোষ্ঠী মেঘালয় থেকে। ফলে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর আচার-আচরণ মেলামেশার ফলে বর্তমানে এক মিশ্র সংস্কৃতি রাভা সমাজে লক্ষ করা যায়, এছাড়াও বর্তমানে শিক্ষার উন্নতির ফলে এই অঞ্চলের রাভা জনজাতির মানুষের মধ্যে মিশ্র সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে।

তথ্যসূত্র

১. বসু, আশিসকুমার, ও চ্যাটার্জী, দেবী (সম্পাদিত) (২০০৪)। *অন্তেবাসী সমাজ, সংস্কৃতি ও উন্নয়ন*। হাওড়া: ম্যানাস্ক্রিপ্ট ইণ্ডিয়া। পৃ. ১৭৯।

২. পাল, সুনীল, (সম্পাদিত) (২০০১)। *রাভা লোকমানস*। জলপাইগুড়ি: কিরাতভূমি। পৃ. ৬৯।

৩. দেব, রণজিৎ (২০১৪)। *উত্তরবঙ্গের উপজাতির ইতিবৃত্ত*। কলকাতা: মেইনস্ট্রীম পাবলিকেশন। পৃ. ৭৮।

৪. রাভা, রাজেন (১৯৭৪)। *রাভা জনজাতি*। গুয়াহাটি: বীনা লাইব্রেরি। পৃ. ১৫।

৫. বসু, আশিসকুমার ও চ্যাটার্জী, দেবী (সম্পাদিত) (২০০৪)। *অন্তেবাসী সমাজ, সংস্কৃতি ও উন্নয়ন*। হাওড়া: ম্যানাস্ক্রিপ্ট ইণ্ডিয়া। পৃ. ১৭৯।

৬. তদেব। পৃ. ১৮১।

৭. দেব, রণজিৎ (২০১৪)। *উত্তরবঙ্গের উপজাতির ইতিবৃত্ত*। কলকাতা: মেইনস্ট্রীম পাবলিকেশন। পৃ. ৮৮।

৮. বিরেন রাভা (পুরুষ, বয়স: ৬৬, পেশা: কৃষিকাজ গ্রাম: বড়বস্তি, গ্রাম পঞ্চায়েত অঞ্চল: শালকুমার ২, জেলা: আলিপুরদুয়ার, সংগ্রহের তারিখ: ১৮-০২-২০১৮)।

৯. রাভা, রাজেন (১৯৭৪)। *রাভা জনজাতি*। গুয়াহাটি: বীনা লাইব্রেরি।

১০. বিষ্ণু রাভা (পুরুষ, বয়স: ৫২, পেশা: কারুশিল্প গ্রাম: ছোটবস্তি, গ্রাম পঞ্চায়েত অঞ্চল: শালকুমার ২, জেলা: আলিপুরদুয়ার, সংগ্রহের তারিখ: ০৪-০২-২০১৮)।

১১. সরেন রাভা (পুরুষ, বয়স: ৫৫, পেশা: বনকর্মী গ্রাম: ছোটবস্তি, গ্রাম পঞ্চায়েত অঞ্চল: শালকুমার ২, জেলা: আলিপুরদুয়ার, সংগ্রহের তারিখ: ০৪-০২-২০১৮)।

১২. দেব, রণজিৎ (২০১৪)। *উত্তরবঙ্গের উপজাতির ইতিবৃত্ত*। কলকাতা: মেইনস্ট্রীম পাবলিকেশন। পৃ. ১১২।

১৩. গীতা রাভা (মহিলা, বয়স: ৪৮ পেশা: অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী, গ্রাম: ছোটবস্তি, গ্রাম পঞ্চায়েত অঞ্চল: শালকুমার ২, জেলা: আলিপুরদুয়ার, সংগ্রহের তারিখ: ০৬-০২-২০১৮)।

১৪. প্রতিমা রাভা (মহিলা, বয়স: ৪৬, পেশা: গৃহবধূ, গ্রাম: ছোটবস্তি, গ্রাম পঞ্চায়েত অঞ্চল: শালকুমার ২, জেলা: আলিপুরদুয়ার, সংগ্রহের তারিখ: ০৬-০২-২০১৮)।

১৫. সমারি রাভা (মহিলা, বয়স: ৫৩, পেশা: গৃহবধূ, গ্রাম: ছোটবস্তি, গ্রাম পঞ্চায়েত অঞ্চল: শালকুমার ২, জেলা: আলিপুরদুয়ার, সংগ্রহের তারিখ: ০৬-০২-২০১৮)।

১৬. www.censusindia.gov.in

১৭. কান্দুরি রাভা (মহিলা, বয়স: ৫২, পেশা: গৃহবধূ গ্রাম: বড়বস্তি, গ্রাম পঞ্চায়েত অঞ্চল: শালকুমার ২, জেলা: আলিপুরদুয়ার, সংগ্রহের তারিখ: ১৮-০২-২০১৮)।

১৮. বিরেন রাভা (পুরুষ, বয়স: ৬৬, পেশা: কৃষিকাজ গ্রাম: বড়বস্তি, গ্রাম পঞ্চায়েত অঞ্চল: শালকুমার ২, জেলা: আলিপুরদুয়ার, সংগ্রহের তারিখ: ১৮-০২-২০১৮)।

১৯. দেব, রণজিৎ (২০১৪)। *উত্তরবঙ্গের উপজাতির ইতিবৃত্ত*। কলকাতা: মেইনস্ট্রীম পাবলিকেশন। পৃ. ১১১।

২০. তদেব। পৃ. ১১৪।

২১. রসবালা রাভা (মহিলা, বয়স: ৫২, গৃহবধূ) ও পুরনী রাভা (মহিলা, বয়স ৫২, পেশা: গৃহবধূ)

গ্রাম পঞ্চায়েত অঞ্চল: শালকুমার ২, জেলা: আলিপুরদুয়ার, সংগ্রহের তারিখ: ১৯-০৮-২০১৮)।

২২. কান্তেশ্বর রাভা (পুরুষ, বয়স: ৫৪, পেশা: মুরগির ফার্মের ব্যবসা গ্রাম: বড়বস্তি, গ্রাম পঞ্চায়েত অঞ্চল: শালকুমার ২, জেলা: আলিপুরদুয়ার, সংগ্রহের তারিখ : ১৮-০২-২০১৮)।

২৩. লতিকা রাভা (মহিলা, বয়স: ৫৫, ,পেশা: গৃহবধূ, গ্রাম: বড়বস্তি, গ্রাম পঞ্চায়েত অঞ্চল: শালকুমার ২, জেলা: আলিপুরদুয়ার, সংগ্রহের তারিখ: ১৮-০২-২০১৮)।

২৪. সাহা, রেবতীমোহন (২০১০) *রাভাদের লোককাহিনী*। কলকাতা: অঞ্জলি পাবলিশার্স। পৃ. ৪৯।

২৫. সনেকা রাভা (মহিলা, বয়স: ৫৪, পেশা: গৃহবধূ গ্রাম: ছোটবস্তি, গ্রাম পঞ্চায়েত অঞ্চল: শালকুমার ২, জেলা: আলিপুরদুয়ার, সংগ্রহের তারিখ: ০৬-০২-২০১৮)।

তৃতীয় অধ্যায়

রাভা সমাজের লুপ্তপ্রায় সংস্কৃতি

ভূমিকা

সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের চিরাচরিত প্রথানুগ জীবনযাত্রা ভেঙ্গে যাচ্ছে। রাভা সমাজও এর ব্যতিক্রম নয়। সমাজের নানান বিচিত্র পূজা-পার্বণ, আচার-আচরণ, রীতি-নীতি, লোকধর্ম, লোকনৃত্য প্রবাহমান কাল ধরে মানুষের বিশ্বাসের উপর নির্ভর করেই চলে আসছে। কিন্তু যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বর্তমান সমাজ জীবনের কাছে তা গুরুত্বহীন হয়ে যাচ্ছে। আলিপুরদুয়ার জেলার রাভা বসতি অঞ্চলগুলিতে ক্ষেত্রসমীক্ষা করতে গিয়ে উঠে এসেছে সেখানকার মানুষের সময়ের সাথে দিনবদলের দিন যাপনের পালা। সময়ের আধুনিকতায় পুরাতন নিয়ম-নীতি, আচার-অনুষ্ঠান, লোকসংস্কার-লোকবিশ্বাস, রাভা সমাজের মন থেকে অনেকটাই মুছে গেছে।

গবেষণাপত্রের এই অধ্যায়ে আলিপুরদুয়ার জেলার রাভা জনজাতির একসময়ের মেনে চলা রিচুয়ালগুলি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। রাভা জনজাতির লুপ্তপ্রায় সংস্কৃতি এই অধ্যায়ের মূল আলোচ্য বিষয়। অর্থাৎ একসময় রাভা সমাজে যে নিয়ম-রীতিগুলি ছিল সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তা কিভাবে হারিয়ে যাচ্ছে, তা দেখানো হয়েছে। যেমন- গর্ভবতী মহিলাদের লুপ্তপ্রায় নিয়ম-রীতি, জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ সংক্রান্ত লুপ্তপ্রায় বিধিনিষেধ, লুপ্তপ্রায় শিশুর নামকরণ, লুপ্তপ্রায় মৃতদেহ সৎকার ও শ্রাদ্ধের নিয়মাবলী, হারিয়ে যেতে বসা মুখোশ শিল্প, লোকনৃত্য, লোকগীত, লুপ্তপ্রায় ডাইনি তন্ত্র-মন্ত্র, লোকচিকিৎসা, লুপ্তপ্রায় খাদ্য গ্রহণ সংক্রান্ত বিধিনিষেধ।

যে কোনো জনজাতির বর্তমান, অতীত, ভবিষ্যৎ ব্যাখ্যা করতে গেলে আমাদের লোকসংস্কৃতির দ্বারস্থ হতে হয়। জ্ঞানের আদি স্থান হল লোকসংস্কৃতি। একটি বিশেষ অঞ্চলের জনজাতির অবস্থান তাদের আচার-আচরণ, জীবনচর্চা, পোশাক-পরিচ্ছেদ, রীতিনীতি, ভাষা, কথাবলার ভঙ্গি, তাদের আসবাবপত্র, বাসস্থান ঘরবাড়ি, খাদ্যদ্রব্য, সবকিছু নিয়ে একটি মানব সমাজের জীবন ও সংস্কৃতি তৈরি হয়। অর্থাৎ এককথায় আমরা বলতে পারি, যে কোনো জনগোষ্ঠীর সামগ্রিক ও প্রয়াসের ফসল লোকসংস্কৃতি। লোকসংস্কৃতির প্রকাশকে নানা ভাবে ভাগ করা হয়ে থাকে, যেমন- লোকাচার, লোকবিশ্বাস, লোকশিল্প, লোকগীত, লোকনৃত্য, লোকসংস্কার, লোকসাহিত্য, ইত্যাদি। আর এখানেই রাভা সংস্কৃতির সঙ্গে লোকসংস্কৃতির সাদৃশ্য।

রাভা জনজাতির এইসব হারিয়ে যেতে বসা সংস্কৃতিগুলি বিশ্লেষণ করে দেখানোর চেষ্টা করেছি একসময় তাদের সমাজে এই সংস্কৃতিগুলির মেনে চলার যে রীতি ছিল, সময়ের কালক্রমে কিভাবে তা হারিয়ে যাচ্ছে এবং এই জেলার বর্তমানের রাভা তরুণ প্রজন্মের মনে এই সংস্কৃতিগুলির কোনো গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে কিনা? এবং তাদের পুরাতন সংস্কৃতির সঙ্গে বর্তমান সংস্কৃতিগুলির কতটা বৈসাদৃশ্য রয়েছে তা আলোচ্য অধ্যায়ে জানতে পারব।

৩.১ গর্ভবতী মহিলাদের রীতিনীতি

রাভা সমাজের কোনো রমণী গর্ভবতী হলে তাদের লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার অনুযায়ী গর্ভবতী মহিলাকে একসময় নানারকম রীতিনীতি মেনে চলতে হত। সন্তান জন্ম দেওয়ার জন্য রাভা মহিলাকে অনেক কষ্টকর জীবন মেনে নিতে বাধ্য করা হত। তাদের সমাজের চাপিয়ে দেওয়া নিয়ম-রীতি তারা মানতে বাধ্য হত। কুসংস্কার তাদের সমাজকে একসময় গ্রাস করে ছিল। সেই অন্ধকারময় কুসংস্কার থেকে রাভা সমাজ অনেকটাই বেরিয়ে আসতে পেরেছে। তাই গর্ভবতী মহিলাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া নিয়ম-রীতিগুলি আজ প্রায় অবলুপ্তির পথে।

রাভা গর্ভবতী মহিলাকে যে সব নিয়মরীতি একসময় মেনে চলতে বাধ্য করা হত সে সম্পর্কে আলোকপাত করা হল। রাভা পরিবারের কোনো রমণী গর্ভবতী হলে গর্ভস্থ সন্তান যেন ভালো ভাবে প্রসব হয় সে জন্য এই জেলার রাভা বসতি অঞ্চলগুলিতে ‘বাই মাবই’ দেবতার পূজা দেওয়ার নিয়ম ছিল। শিশুর জন্ম হওয়ার পরে ধাত্রী বাঁশের তোয়াল দিয়ে নাড়ীচ্ছেদ করে এবং গর্ভের ফুল কলাপাতা দিয়ে মুড়ে মাটি গর্ত করে পুঁতে দিত।

গর্ভবতী হওয়ার সাত মাস হয়ে গেলে স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হতে পারত না। কবর স্থান বা অশৌচ পালিত হচ্ছে এমন বাড়িতে যাওয়া ছিল বারণ। রাভা মহিলা গর্ভবতী হলে তার স্বামী জীবন্ত মাছ বা পাখি ধরতে পারত, কিন্ত মৃত পশু বা পাখি ছোঁয়া ছিল বারণ। মই নিড়ানি, অথবা খুঁটির সঙ্গে বেঁধে রাখা গরু বা ছাগলের দড়ি মারাতে পারত না। একা একা বনে, নির্জন পুকুরে বা নদীর পাড়ে যাওয়া ছিল বারণ। কোন সামাজিক বা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশ নিত না। জল ভরা কলসিও কাঁখে নেওয়া ছিল বারণ। সন্ধ্যা নামার পর কখনো এলো চুলে ঘরের বাইরে যেত না। অচেনা বা বাইরের কোনো লোকের দেওয়া খাবার খেতে দেওয়া হত না।

কোনো কিছুর বীজ, কলার মোচা, লাউ, লাউ শাক খাওয়াও ছিল নিষেধ না। ওঝার দেওয়া মঙ্গলসূত্র কোমরে বেঁধে রাখতে হত। প্রথম বা পরবর্তী গর্ভকালীন সময়ে রাভা পরিবারগুলি ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করতে না। রাভা দম্পতিকে ভুত-প্রেত, অপদেবতার কু-নজর থেকে সবসময় সতর্ক থাকার চেষ্টা করা হত। সন্তান জন্মের দিন আসন্ন হলে 'ধাই'কে জানিয়ে রাখা হত। 'ধাই' ইন্দ্রজালিক অনুষ্ঠান বা তুক তাকের সাহায্যে বুঝতে পারত যে কখন প্রসব হবে এবং তা কষ্টকর হবে কিনা।[১] যদি মনে হত যে দুই-এক দিনের মধ্যে প্রসব হতে পারে তাহলে 'ধাই' গর্ভবতী মহিলার বাড়িতেই থেকে যেত। 'ধাই' অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে সবকিছু প্রত্যক্ষ করত। প্রসবের দিন এলে তিনি গর্ভবতী মহিলার সব দায়িত্ব একাই নিজ হাতে নিতেন। প্রসবের দিন তিনি তেল, জল ভরা কলসি, গাছের পাতা, ইত্যাদি উপকরণ সঙ্গে রাখতেন। প্রসব আসন্ন হলে গর্ভবতী মহিলা জানু পেতে অথবা উরু হয়ে বসতেন। প্লাসেন্টা অথবা ফুল না বের হওয়া পর্যন্ত শিশুকে প্রথমে মাটিতে রাখা হত ধরিত্রী দেবীর আশীর্বাদ লাভের জন্য। শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই 'ধাই' তীক্ষ্ণ ধার বাঁশের সাহায্যে বন্ধনি নালি ছিন্ন করে দিত। কাটা নাভির উপর কলাগাছের ছাল পোড়ানো ছাই মাখিয়ে রাখা হত। প্ল্যাসেন্টাটি কলা গাছের বকল দিয়ে তৈরি ডোঙ্গার উপর রেখে সেটা ঘরের ভেতর অথবা বাইরের মাটিতে পুঁতে দেওয়ার নিয়ম ছিল। প্রসবের দিনেই শিশু ও জননীকে স্নান করিয়ে দিতে হত। কিন্তু প্রসবের দিনে জননীকে কোনো খাবার দেওয়া হয় দেওয়া হত না। গর্ভবতী মহিলার সন্তান হওয়ার পর দু-তিন দিন বাদে ভাত ডাল খেতে দেওয়ার নিয়ম ছিল। সন্তান হওয়ার পর রাভা পরিবারের সবাইকে ত্রিশ দিন অশৌচ পালন করতে হত। অশৌচান্তে নাপিত এনে নবজাতক শিশুর চুল ও নখ কাটতে হত। শিশু জন্মের দুই সপ্তাহ বাদে নামকরণ করার রীতি ছিল।

কিন্তু বর্তমানে রাভা গ্রামগুলিতে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র গড়ে ওঠায় স্বাস্থ্য পরিসেবা অনেক উন্নত হয়েছে। রাভা সমাজ থেকেই আশা কর্মী নিয়োগ করা হয়েছে। তাই এখন কোনো মহিলা গর্ভবতী হলে 'ধাই'য়ের প্রয়োজন পড়েনা। আশা কর্মীরা গর্ভবতী মহিলার বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে ডাক্তারি চিকিৎসা নেওয়ার সু-পরামর্শ দেন। গর্ভবতী মহিলাকে স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন করান। এমন কি আশা কর্মীরাই গর্ভবতী মহিলাকে গ্রামীণ বা জেলা হাসপাতালে নিয়ে যান প্রসবের জন্য। বাড়ির বয়স্ক পুরুষ-মহিলাদের লোকবিশ্বাস ও কুসংস্কার ভূত, পেত ডাইনি, অপদেবতা সম্পর্কে সচেতন করান। আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থায় ডাক্তারি পরিষেবা উন্নত হওয়ার গর্ভবতী মহিলার উপর যে

রীতি-নীতি তাঁদের সমাজ একসময় চাপিয়ে দিয়ে ছিল সেসব কুসংস্কারগুলো অবনতি ঘটেছে সময়ের সাথে। আলিপুরদুয়ার জেলার রাভা গ্রামগুলিতে বর্তমানে 'ধাই'য়ের তেমন অস্তিত্ব নেই।[২]

৩.২ শিশুর নামকরণ

প্রত্যেক জনজাতির ক্ষেত্রেই নামকরণের একটা নিজস্ব রীতি থাকে। রাভা সমাজ তার ব্যতিক্রম নয়। আলিপুরদুয়ার জেলার রাভা গ্রামগুলিতে একসময় শিশুর নামকরণ অনুষ্ঠান হত শিশুর জন্মের দুই সপ্তাহ বাদে। শিশুর নামকরণের ক্ষেত্রে দাদু-দিদা অথবা ঠাকুমা-ঠাকুরদার নামের সাথে মিল রেখে নাতি-নাতনির নাম রাখার একটা প্রচলন ছিল। এভাবে নাম রাখার প্রচলন থাকায় নামের মধ্যে তেমন কোনো নতুনত্ব দেখা যেত না। তাদের নামের মধ্যেই বোঝা যেত যে তিনি কোন্ সম্প্রদায়ের। আমরা যদি আলিপুরদুয়ার জেলার রাভা গ্রামগুলির দিকে তাকাই তা হলে দেখব রাভা গ্রামগুলি বেশির ভাগই চা-বাগিচা অঞ্চলে অবস্থিত। ফলে অন্য সমাজের মানুষের সাথে তাদের মেলবন্ধন হতে দেখা যেত না। তারা বেশির ভাগই তাদের সমাজের মধ্যে আবদ্ধ থাকতে পছন্দ করত। সে জন্যই হয়ত তারা অন্ধ কুসংস্কার মেনে নিয়েছিল সহজেই এবং পুরাতন রীতি-নীতি থেকে সহজে বের হতে পারছিল না। পুরাতন রীতি-নীতি মেনেই তাদের সমাজে নাম রাখার প্রচলন ছিল। রাভা সমাজে গ্রামের ব্রাহ্মণ বা অধিকারী পঞ্জিকা দেখে শিশুর নামকরণের দিন ঠিক করত।[৩]

'চুয়া কামাও' বা অশৌচান্তিক অনুষ্ঠানের দিনও নামকরণ করা হত। সেদিন আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের নিমন্ত্রিত করা হত। শিশুর মাতৃ সম্পর্কে দাদু বা মামাকে অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন করতে হত এবং ওই দিন সকালে দাদু অথবা মামাকে স্নান সেরে নতুন ধুতি পরতে হত। ব্রাহ্মণ বা অধিকারী কলাগাছের বাকলে দিয়ে একটি ডোঙা তৈরি করত। তারপর সেখানে জল ঢালত এবং শিশুকে নিজের কোলে বসিয়ে শিশুর একটি নামটি উচ্চারণ করত। ডোঙার জলের মধ্যে একটি চাল ফেলত চালটি না ভেসে উঠলে আবার একটি অন্য নাম উচ্চারণ করা হত এবং পুনরায় আবার একটি চাল ফেলা হত। চাল না ভাসা পর্যন্ত এই প্রক্রিয়া চলতে থাকত। যখন চালটি ভেসে উঠত সেইসময় উচ্চারিত নামটিই রাখা হত।

নিকট আত্মীয়দের নাম বাদ দিয়ে রাভা সমাজে নামকরণের রীতি প্রচলিত ছিল। দিন-মাস কোনো পশু, পাখি, ফল-মূল, বা দেবতার নামে রাভা সমাজে শিশুর নামকরণ করা হত। আলিপুরদুয়ার জেলার রাভা বস্তিগুলিতে জ্যৈষ্ঠ, ভাদ্র, পৌষ, চৈত্র মাসে শিশুর নামকরণ অনুষ্ঠান ছিল নিষিদ্ধ। শুধু মাস নয় বিশেষ বারেও নামকরণ ছিল নিষিদ্ধ। যেমন শুক্রবার বা শনিবার, মাসের শেষ দিন এবং পূর্ণিমা তিথির দিন তাদের সমাজ নামকরণ অনুষ্ঠান হত না। নামকরণের পর আমন্ত্রিত আত্মীয় স্বজনদের ভাত এবং মাছের ঝোল পরিবেশন করা হত। চাল পচিয়ে চকোৎ (মদ) বানিয়ে নেশা করে আনন্দ উৎসবে মেতে উঠত।[৪]

কিন্তু এখন রাভা পরিবারের সন্তানের নামকরণে ক্ষেত্রে আগের নিয়মরীতি মেনে চলা হয় না। তাদের নামের ক্ষেত্রেও আধুনিকতা এসেছে। পিতৃপুরুষের নামের সাথে মিল রেখে একসময় তাদের সমাজে যে নামকরণ রাখার প্রচলন ছিল সেই রীতির অবলুপ্তি ঘটেছে। কেননা তাদের সমাজে দেখা যেত যে দাদু অথবা ঠাকুরদার নামের সাথে নাতি নাতনির নামকরণের মিল রয়েছে। আর শিশু সন্তান যদি কন্যা হয় তাহলে দিদা অথবা ঠাকুমার নামের সাথে মিল রেখে নামকরণ করার একটা রীতি তাদের সমাজে প্রচলিত ছিল। কিন্তু এখন রাভা পরিবারগুলিও শিশুর নামকরণের ক্ষেত্রে ছোট ছোট নামকেই প্রাধান্য দিচ্ছে। তাদের মধ্যেও ডাক নাম রাখার প্রচলন রয়েছে। তাই সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নামকরণের পুরাতন নিয়ম-রীতিগুলির অবলুপ্তি ঘটছে।

৩.৩ বিবাহ সংক্রান্ত বিধিনিষেধ

রাভা জনজাতির মানুষের সাথে কথা বলে জানতে পেরেছি তাদের সমাজে একসময় স্বামী-স্ত্রী উভয়ক্ষেত্রেই বহুবিবাহ প্রথার প্রচলন ছিল। এমনকি তাদের মধ্যে ‘সমূহীয়া বিবাহের’ প্রচলন দেখা যেত। একই গোত্র কিংবা মিত্র গোত্রের মধ্যে বিবাহ হত না। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল রাভা মহিলারা একসময় একের অধিক পুরুষকে বিয়ে করতে পারত আর এই বিবাহকে তারা বহু স্বামী বিবাহ বলত। প্রাচীন হিন্দু ধর্ম-গ্রন্থ মহাভারতে যেমন দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামী ছিল সেরকমই রাভা মহিলা একসাথেই পাঁচ-ছয় জন স্বামীর সাথে ঘর করত। তেমনি আবার একজন রাভা পুরুষ একসঙ্গে তিন, চারজন রাভা মহিলাকে বিয়ে করতে পারত। এছাড়াও তাদের সমাজে একসময় একসঙ্গে অনেক পুরুষ মহিলার জোড়া-জোড়া বিয়ের আয়োজন করা হত। সেই বিয়েকে তাদের ভাষায় সমূহীয়া বিবাহ বলত।

কিছু কিছু রাভা পরিবারে আবার চুক্তি মতে বিবাহ প্রথার প্রচলন ছিল। কোনো গরিব পাত্র কন্যা শুল্ক দিতে অসমর্থ হলে হবু শ্বশুর বাড়িতে প্রায় দুই বছর কাজ করত। এই কাজের বিনিময়ে কোনো অর্থ পেত না। দুই বছর হয়ে গেলে তিনি বিয়ে করতে পারত এবং শ্বশুর বাড়িতেই থেকে যেত। কোনো মহিলা বিধবা হলে তাদের সমাজে পুনঃবিবাহ প্রথা ছিল।[৫]

রণজিৎ দেব *উত্তরবঙ্গের উপজাতির ইতিবৃত্ত* গ্রন্থে বলেছেন কোনো বিধবা রমণীর বিয়ে করার ইচ্ছা থাকলে নিজের গোত্রের বাইরে অন্য গোত্রের পুরুষকে বিয়ে করতে পারত। এক গোত্রের কাউকে বিয়ে করা ছিল তাদের সমাজের নিয়ম বিরুদ্ধ। বিচ্ছেদ হয়ে যাওয়া স্ত্রী অথবা পুরুষকেও নিজের গোত্রের বাইরে বিয়ে করতে হত। বিবাহ বিচ্ছেদে 'পান ছেঁড়া' প্রথা চালু ছিল। বহু আগে এই প্রথা রাভা সমাজে ছিল। তাদের সমাজের পুরোহিত বা অধিকারী উঠোনে প্রদীপ জ্বালিয়ে দুজনকে দু-দিকে দাঁড় করিয়ে দিত এবং হাতে পান ধরিয়ে দিয়ে টানাটানি করে পানটিকে ছিঁড়ে ফেলতে হত। এই পান ছিঁড়ার সঙ্গে সঙ্গে চিরদিনের মত বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়ে যেত।

রাভা জনজাতির ছেলে-মেয়ের একসময় বিয়ে হত আলাপ আলোচনার মধ্য দিয়ে। কোনো পরিবারে বিয়ের উপযুক্ত ছেলে বা মেয়ে থাকলে তাদের আত্মীয়-স্বজন তাদের বিয়ের সম্বন্ধ নিয়ে আসত। দুই পরিবারের সম্মতি নিয়ে বিয়ের আয়োজন করা হত। তাদের সমাজে কন্যা শুল্ক প্রথা ছিল। অর্থাৎ কন্যার পরিবারকে পাত্রপক্ষের পণ দিয়ে বিয়ে করতে হত। বহুবিবাহ প্রথা তাদের মধ্যে বেশি ছিল না। ক্রস কাজিন বিবাহ তাদের মধ্যে নেই। দেবর ও ভ্রাতৃবধূকে বিবাহ তাদের মধ্যে নিষিদ্ধ ছিল। স্ত্রী মারা গেলে শ্যালিকাকে তারা বিয়ে করতে পারত। মাতৃবংশ এবং স্ব-গত্রে বিবাহ ছিল নিষিদ্ধ তবে নিজ জাতির মধ্যে এবং উচ্চবর্ণের হিন্দুর সাথে বিয়ে হত। মেচ-গারোদের সাথে রাভা সমাজের কোনো ছেলে বা মেয়ের বিয়ে হত না। অ-রাভা কেউ রাভা রমণীকে বিয়ে করলে তাকে রাভা হয়ে যেতে হত। রাভা সমাজ তিন ধরনের বিয়ে অনুমোদন করত, কন্যাক্রয়, সম্প্রদান, শ্রমের বিনিময়ে বিয়ে। বেশিরভাগ রাভা পরিবারের ছেলে মেয়েদের আঠারো-উনিশ বছরের বিয়ে দেওয়া হত। বরের বয়স অপেক্ষাকৃত বেশি হয়। নাবালিকা বিবাহও দেখা যেত। তবে ভাসুর বিবাহ ছিল নিষিদ্ধ।

একগোত্র কিংবা বন্ধু গোত্রের সাথে বিবাহ ছিল নিষিদ্ধ। তাদের সমাজে সাধারণত ফাল্গুন ও চৈত্র মাসে বিবাহ হত। বছরের অন্যান্য মাসগুলোতে বিবাহ দেওয়ার তেমন কোনো রীতি ছিল না। ঘটককে বিয়ের পুরো দায়িত্ব নিতে হয়। পাত্রপক্ষের বাড়ি থেকে কনের বাড়িতে উপহার হিসেবে মোরগ, শূকরের মাংস, পান, সুপারি নিয়ে যাওয়া যাওয়ার নিয়ম ছিল। এরপর পুরোহিতের

উপস্থিতিতে কনে, বরের মাথায় পাগড়ি বেঁধে দেওয়ার পর বিয়ের দিনক্ষণ স্থির করা হত। দিনক্ষণ স্থির হওয়ার পর যদি কোনো কারণবশত বরপক্ষ বিয়ে ভেঙ্গে দিত তাহলে শাস্তি এবং কন্যাপক্ষকে জরিমানা প্রদান করতে হত। বিয়ের দিন বরপক্ষ কন্যাপক্ষের বাড়িতে আসত বিভিন্ন উপকরণ নিয়ে। কেননা কন্যার পিতাকে বিয়ের দিন বিভিন্ন উপঢৌকন দিতে হত।[৬]

অন্য সমাজের মত রাভা সমাজেও বিবাহ অনুষ্ঠিত হয় রাত্রি বেলায়। মেয়ের বাড়ির উঠোনেই বিয়ে দিন বিয়ের রীতিগুলি পালন করতে হত। উঠোনে রাখা থাকত দুটো হাঁড়ি একটিতে চকোৎ (মদ) এবং অন্যটিতে জল ভরা থাকত। সারাঙ্গা (পুরোহিত) হাঁড়ি দুটির পাশে বর ও কনেকে দাঁড় করিয়ে বরের হাতের উপর কনের হাত রেখে তার ওপর ফুল ও দূর্বা, ছড়িয়ে চকোৎ ও চালের ছিটা দিয়ে তাদের কাপড়ে গিট বেঁধে সকলের সামনে এদের বিবাহিত ঘোষণা করত বিয়ের পরের দিনেই কনেকে স্বামীর ঘরে আসতে হত। এরপর স্বামীগৃহে কনেকে বিভিন্ন রীতিনীতির সম্মুখীন হতে হত। বিয়ের পরের দিন স্বামীর গৃহের উঠোনে একটি মুরগির গলা কেটে ছেড়ে দেওয়া হত। যদি দেখা যেত যে মুরগি ডান পা, বাঁ পায়ের থেকে লম্বা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তবে নতুন দম্পতির পক্ষে তা শুভ বলে মনে করা হত। তাদের সমাজে একসময় স্ত্রীর বহুপতি থাকলেও পরবর্তীতে সেই প্রথার অবলুপ্তি ঘটেছে। ঘরজামাই প্রথা বর্তমানে বিলুপ্তপ্রায়। মাতুল পুত্রের সাথে বিবাহ বিধিসম্মত ছিল। পিসি অথবা কাকার পুত্র-কন্যাদের মধ্যে বিবাহ একসময় হত। কোনো কোনো রাভা পরিবারে একসময় সন্তান জন্মের পর আনুষ্ঠানিক বিবাহের আয়োজন করা হত। তাদের সমাজের বাইরে বিবাহ ছিল নিষিদ্ধ। তবে বর্তমানে এইসব নিয়মনীতির কোনো বালাই নেই। কিন্তু এখন আলিপুরদুয়ার জেলার রাভা পরিবারগুলিতে বর বা কনে কিনে এনে বিয়ে হওয়ার প্রথা আর নেই।[৭]

রাভাদের লোককাহিনী গ্রন্থে রেবতীমোহন সাহা বলেছিলেন রাভা সমাজে তিন প্রকার বিবাহের নিয়ম চালু ছিল। যাদের আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল তারা বর বা কনে কিনে এনে বিয়ে দিত। আর যাদের আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না তারা কন্যার বাড়িতে শ্রমের বিনিময়ে বিয়ে করত। কিন্তু এখন বর বা কন্যা কিনে এনে বিয়ে করার প্রথা তাদের সমাজে সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হয়েছে। এখন রাভা গ্রামগুলিতে সামাজিকভাবে আলাপ-আলোচনা করে অভিভাবকদের কর্তৃত্বে বিয়ে হয়। একসময় রাভা বস্তিগুলিতে প্রায় দেখা যেত যে বাড়ির ছোট মেয়েকে মামার পুত্রের সাথে বিয়ে দিয়ে ঘরজামাই রাখা হত। তাদের সমাজে এই বিয়ের নাম ছিল 'নোক্‌রেখ প্রথা'। এই প্রথা এখন রাভা সমাজে আর দেখা যায় না।

এছাড়াও রাভা পরিবারের কোনো ছেলে বা মেয়ে অল্প বয়সে বিয়ে করতে চাইলে কিছু নিয়মরীতি তাদের মেনে চলতে হত। যেমন মুরগির গোলা কাটার পর সেই রক্ত দিয়ে 'রৌন্তক দেবীর' পূজা দিয়ে মন্ত্র উচ্চারণ করে বিয়ে দেওয়ার রীতি ছিল। কিন্তু এখনকার রাভা সমাজও সভ্য সমাজের মত কোনো রীতির তোয়াক্কা করেন না। বিবাহের মত সামজিক ক্ষেত্রে রাভা পরিবারগুলিও অনেকটা কুসংস্কার মুক্ত হতে পেরেছে।[৮]

৩.৪ মৃতদেহ সৎকার ও শ্রাদ্ধের নিয়মাবলী

রাভা সমাজ মৃতদেহ সৎকার নিয়ে একসময় নানা রকম নিয়মাবলী মেনে চলত। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে সেসব নিয়মরীতিগুলি আজ আর তেমন দেখা যায় না। রাভা গ্রামগুলিতে রাভা পরিবারের কেউ মারা গেলে তাদের সমাজের নিয়ম মেনে পুরুষ বা মহিলা মারা গেলে মৃতদেহ উত্তর শিয়রে চাটাইয়ের রাখা হয়। তারপর চাটাইয়ের চারকোণা কেটে ঘরের মধ্যেই মৃতদেহকে শুইয়ে দেওয়া হয়। এই নিয়ম রাভা সমাজে 'পিরপাটাং' বলে পরিচিত ছিল। সেইসময় আত্মীয় স্বজন সমবেত হয়ে মৃতদেহের উদ্দেশ্যে চকোৎ (মদ), চিকা (জল) ও খাদ্যদ্রব্য একটু করে মুখে ঢেলে দেয়। তাদের প্রতিবেশীরা তখনই বাঁশ দিয়ে খাটিয়া তৈরি করে এবং সেই খাটিয়ায় তারা মৃতদেহ তুলে ঘরের বাইরে আনত। যে ঘরে মৃত ব্যক্তি থাকত সেই ঘরের চালের খড় উঠোনে ছড়িয়ে দিয়ে তার উপর উদ্দাম নৃত্য ও গান করত।

কেননা একসময় দেখা যেত স্বাভাবিক ভাবে মৃত্যু হলে দাহ করা হত। কিন্তু কলেরা বসন্ত বা অপমৃত্যু হলে (দুর্ঘটনায় আহত হয়ে মৃত্যু হলে অথবা আত্মহত্যা করলে) গোর দেওয়া হত। বাঘের আক্রমণে মৃত্যু হলে দাহ করার নিয়ম ছিল। আট বছরের কম বয়সী শিশু মারা গেলে সমাধি দেওয়া হত। মৃতদেহ শ্মশানে নিয়ে যাওয়ার পূর্বে চাল থেকে তৈরি মদ (স্থানীয় ভাষায় চকৎ) মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে অর্পণ করা হত। ঢাল-তরোয়াল নিয়ে যুদ্ধের সাজে মৃতদেহকে শ্মশান যাত্রায় নিয়ে যাওয়া হত। দাহকার্য শেষ হলে মৃত ব্যক্তির আত্মা ঘরে নিয়ে আসা হত। নানা রকম নৃত্য-গীত করে অস্থি ঘরে বহন করে আনত। কিছুদিন পর সেই অস্থি 'তুরাহাকারে' নিয়ে যেত। 'তুরাহাকার' হল পর্বত গাত্রে খোদিত গর্ত যে স্থানে মৃত ব্যক্তির ভগ্নাবশেষ রক্ষিত হয়। মৃতসৎকার করে আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী মৃতব্যক্তির বাড়িতে আসত এবং ঘরের মেঝেতে কাপড় বিস্তৃত করে কাপড়ের উপরে বসত। মৃত ব্যক্তি যদি পুরুষ হয় তাহলে সেই কাপড় পুরুষের হবে, মৃত ব্যক্তি মহিলা হলে সেই কাপড় মহিলার হবে।

কাপড়ের উপর চকোৎ (মদ) রেখে মৃতব্যক্তির আত্মাকে ডাকা হত। চকোৎ পান করবার জন্য অনুরোধ করা হত। মৃত্যুর একমাস পর রাভা পরিবারে শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান করা হত। আর মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে এই বলা হত যে, পরিবারে যেন কোনোরূপ প্রদর্শন না করেন এবং তাদের কথা একেবারে যেন ভুলে যান। ধনী রাভা পরিবার প্রতি বৎসরান্তে আত্মীয়-স্বজন নিমন্ত্রণ করে শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান করত। কিন্তু এখন আর প্রতি বৎসরান্তে এই শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান দেখা যায় না। বাড়ির চাউলের দ্বারা চকোৎ তৈরি করত এবং সেই চকোৎ পান করে স্ত্রী-পুরুষ সকলেই একসাথে নৃত্য করে মৃত ব্যক্তির আত্মাকে উদ্দেশ্যে করে গান গাইত। তাদের স্থানীয় ভাষায় গানের অর্থ ছিল এরকম, রাভাদিগের ধনী পরিবারে তুমি জন্ম গ্রহণ করবে, কোনো প্রকার বৃক্ষ, লতা হয়ে জন্ম গ্রহণ করবে না। যদি তুমি গাছ হয়ে জন্ম নাও তাহলে লোকে তোমাকে অগ্নিদগ্ধ করবে, এবং কোন প্রকার পশু পাখি হয়ে জন্ম নিবে না, যদি নাও তাহলে লোকে তোমাকে মেরে খাবে, তুমি যদি গরু হয়ে জন্ম নাও তাহলে লোকে তোমায় লাঙ্গল চাষ করাবে।[৯]

রাভা পরিবারে যদি কোনো শিশু মারা যায় তাহলে সেই শিশুর পায়ের বা হাতের আঙুলের কিছু অংশ কেটে তারপরে সৎকার করার নিয়ম ছিল। তাদের বিশ্বাস যে, সে মৃত শিশুর আত্মা পুনরায় সেই পরিবারে জন্মগ্রহণ করবে এবং তাহলে তার আগের কাটা অংশ দেখে তাকে চিহ্নিত করতে পারবে। যদি কোন নবজাত শিশুর অঙ্গুলিতে ওইরূপ কাটা চিহ্ন দেখা যেত তাহলে তারা মনে করতেন সেই মৃত শিশুর আত্মা পুনরায় জন্ম গ্রহণ করেছে। যে ঘরে রাভা ব্যক্তি মারা যায় সেই ঘরের ভিতরে সাজানো হয় পিণ্ডি প্রশস্ত। একটি বড় কলা পাতার আগার উপর বেশ কিছু ভাতের নাড়ু তৈরি করে ভাগে ভাগে বসানো হত এবং পাশেই একটা 'চোঙ্গা অর্থাৎ কলার খোলের তৈরি পাত্রে চাল ভেজে গুঁড়ো করে, সেই চালের গুঁড়ো দিয়ে 'চোঙ্গা ভর্তি করে দিয়ে আলগা ভাবে পাতা দিয়ে ঢেকে দেওয়া হত। 'চোঙ্গা'র পাশেই তির ধনুক সাজিয়ে রেখে দেওয়া হয় এবং সেখানে মদ, জল মৃত ব্যক্তির আত্মার উদ্দেশ্যে নিবেদন করা হত। এর কারণ হিসেবে তারা মনে করে যে মৃত ব্যক্তির আত্মা কিরূপ ধারণ করেছে এবং তার পদচিহ্ন বোঝার জন্য চালের গুঁড়ো রাখা হয় এবং মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে তারা একটি শূকর বলি দিত। এই প্রথাকে তারা বলত 'তৌশুঁনি'। এই প্রথা অনুযায়ী উঠোনের মাঝখানে কলাপাতা দিয়ে একটা আসন বানিয়ে সেখানে একটা মুরগি রেখে বাঁশের সূঁচ দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মেরে ফেলা হত। এই কাজ যারা করে রাভা ভাষায় তাদের 'বাঁলেক' বা মরা কাটা ব্যক্তি বলা হয়। মৃত ব্যক্তিটিকে স্বর্গে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করাই এই রীতির মূল উদ্দেশ্য ছিল।

এরই পাশাপাশি মৃত ব্যক্তি যদি ইহজগতে কোনো পাপ করে থাকেন, তবে তাকে যেন ঈশ্বর মাপ করে দেন। সেজন্য একটি জীব উপহার হিসাবে পাঠিয়ে দেওয়ার রীতি বলে মনে করা হত। এই সব যাবতীয় কাজের পরে শুরু হত জলদান পর্ব। এই জলদান পর্ব রাভা সমাজে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং কঠোর শৃঙ্খলাবদ্ধ রীতি। মৃত ব্যক্তি যে গোত্রের হবেন সেই গোত্রের জল তাকে দিতে হবে। প্রতিটি গোত্রের জলদানের পর্বে কয়েকটি গোপনীয় কথা ছিল। সেই গোপনীয় কথা সেই পরিবারের কোনো সদস্য বা সেই গোত্রের অন্য কোনো বয়স্ক মাতৃ স্থানীয় মহিলা ছাড়া অন্য কারো পক্ষে জানা সম্ভব নয়। সেই মহিলা তার মৃত্যুর আগের মুহূর্তে তার কোনো কন্যা সন্তান বা সেই গোত্রের স্থানীয় কোনো আত্মীয়কে বলে যেতেন। এই রীতি অতি প্রাচীন কাল থেকে চালু থাকলেও বর্তমানে আলিপুরদুয়ার জেলার রাভা জনবসতি অঞ্চলে আর দেখা যায় না।[১০]

৩.৫ মাতৃজাতির প্রাধান্য

পূর্বে খাদ্য সংগ্রহের ভূমিকায় নারী-পুরুষের সমান দায়িত্ব থাকলেও সন্তানের জন্ম দেওয়া ও প্রতিপালনে নারীর বিশেষ ভূমিকা ছিল। সমাজে বিশেষ প্রাধান্য ছিল নারীর। এই সামাজিক প্রাধান্যের কারণেই সন্তানের বংশ পরিচয় নিরূপিত হত মায়ের দিক থেকে। নারীরাই একসময় সমাজকে নির্ধারন করত এবং পরিবারের কর্তৃত্ব তাদের হাতেই ছিল। *আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় গবেষকদের সেমিনার উপস্থাপনাপত্র সংকলন* প্রবন্ধ গ্রন্থে দেবস্মিতা রায় তাঁর একটি প্রবন্ধে বলেছেন রাভা পরিবারগুলিতে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয় মেয়েরা, বিশেষ করে তাদের পরিবারের সবচেয়ে ছোট-মেয়েরাই জমি মালিকানা ভোগ করে। এই ভাবে সম্পত্তি মায়ের থেকে মেয়ে হাতে আসে। কৃষিকাজের উপর ভিক্তি করেই গড়ে উঠেছিল এদের জীবিকা। ফলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই জমিই তাদের প্রধান সম্পত্তি ছিল। বিয়ের পর স্বামী স্ত্রীর বাড়িতে থাকত এবং স্ত্রীর সম্পত্তি রক্ষনাবেক্ষণ করত।

শিকারি জীবনে মেয়েরা বিশেষ প্রাকৃতিক কারণে আগের মত উপযোগী না হওয়ায় এর পুরো দায়িত্বই পুরুষের উপর বর্তায় এবং সমাজে পুরুষ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। ভারতবর্ষের মাতৃপ্রাধান্যের সবচেয়ে মূল তত্ত্বটি কৃষিকাজের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। ভারতীয় সংস্কৃতিতে কৃষিবিদ্যা আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে নারীর যোগ সূত্রের কথা প্রায় সব পণ্ডিতই স্বীকার করেন। কৃষি পদ্ধতি আবিষ্কারের প্রারম্ভিক কৌশল আয়ত্তের মধ্য দিয়ে সমাজে মাতৃপ্রাধান্য প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল।

পাশাপাশি জমি থেকে খাদ্য উৎপাদনের কৌশল আবিষ্কার করে সমাজের অন্তঃ-কাঠামোর পরিবর্তন করে মেয়েরাই। আদিম যাযাবর জীবন থেকে স্থায়ী জীবনের সন্ধান দিত মেয়েরাই। লক্ষ করলে দেখা যাবে প্রাচীন সমাজে উত্তরাধিকার সূত্রে সন্তানের পরিচয়কে নিয়ন্ত্রন করত নারীরাই। এমনকি সমাজকেও মহিলারাই নিয়ন্ত্রন করত। শিশু গর্ভে ধারণ করা থেকে তার ভূমিষ্ঠ হওয়া পর্যন্ত এবং তাকে বড় করার দীর্ঘ সময়ের ব্যাপ্তি পুরোটাই জুড়ে আছে নারীর অসীম ধৈর্য্য ক্ষমতা। কিন্তু আধুনিক কৃষি সমাজ ব্যবস্থায় পুরুষের দায়িত্ব বেড়ে যায়। একসময় দেখা যেত যে কৃষিক্ষেত্রে ভূমি কর্ষণ থেকে ফসল ফলানো পর্যন্ত নারীরাই প্রধান ভূমিকা পালন করত। ঐতিহ্য সংরক্ষণের দায় পালন করার সঙ্গে সঙ্গে স্থায়ী খাদ্য উৎপাদনের উপর জোর দেওয়া এবং শিকারিজীবী যাযাবর মানুষকে সঠিক পথ দেখাত নারীরাই। সমাজের নারীর প্রবল প্রভাবের কারণেই সন্তানের পরিচয় মাতৃবংশ অনুসারে হত। একটি পূর্ণ মাতৃপ্রাধান্য সমাজে সন্তান ছেলে বা মেয়ে যাই হোক না কেন বংশ পরিচয় মাতৃগোত্র থেকে নির্ণীত হত।[১১]

পরবর্তীতে উন্নত কৃষি ব্যবস্থায় বিশেষত লাঙ্গলের ব্যবহারের ফলে উৎপাদনের সঙ্গে নারীর বিচ্ছেদ ঘটে। স্বভাবতই তাদের সমাজ জীবনে মৌলিক চাহিদা নিষ্পত্তির দ্বারা সমাজে একটা বড় পরিবর্তন আসে। সামাজিক ক্ষেত্রে নারীর গুরুত্ব কমে যায়। আধুনিক কৃষিকাজে অনভ্যস্ত এমন অনেক রাভা পরিবারে নারীর প্রভাব অপেক্ষাকৃত কমে যেতে শুরু করে। বর্তমানে আলিপুরদুয়ার জেলায় আদিম মাতৃপ্রাধান্যের এই নির্দেশন উত্তরবঙ্গের প্রান্তীয় অঞ্চলে বসবাসকারী রাভা জনগোষ্ঠীর ঐতিহ্যের মধ্যে আজ দেখা যায় না। নতুন কৃষি ব্যবস্থায় নারী অপেক্ষা পুরুষ অধিক উপযোগী হওয়ায় কৃষিকাজে পুরুষের অধিকারে প্রাধান্য আসে। স্বভাবতই এতদিনের মাতৃপ্রাধান্য লুপ্ত হতে দেখা যায়।[১২]

৩.৬ মদ্যপান তৈরি প্রণালী ও খাদ্য

রাভা জনজাতির মানুষেরা একসময় জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ যে কোনো উৎসব অনুষ্ঠানে তারা চকোৎ (মদ) পান করত। এরা খুবই সহজ সরল এবং মদ্য প্রিয়। তাদের ঘরের চাল দিয়ে যে মদ তৈরি করা হয় তার নাম চকোৎ । জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ, উৎসব, পূজা যাই হোক না কেন এই চকোৎ ছিল আবশ্যিক। আর চকোৎ তৈরির প্রধান ওষুধ হল 'বাখব' এই ওষুধ ছাড়া চকোৎ তৈরি করা সম্ভব হত না। রাভা পরিবারগুলি অনাহার, দুঃখ-কষ্টের কথা চিন্তা করত না।

তাদের এইধরনের জীবনের মূলে ছিল তাদের তৈরি চকোৎ অর্থাৎ চাল থেকে তাদের নিজস্ব পদ্ধতিতে তৈরি মদ। পূজা-পার্বণ, সামাজিক-অনুষ্ঠান, বিবাহ, অতিথি-আপ্যায়ন, শ্রাদ্ধ-সবক্ষেত্রেই প্রয়োজন হত এই চকোৎ এর। ফলে তাদের জমি থেকে যে ফসল উৎপন্ন হত তার একটি মোটা অংশ মদ তৈরিতে ব্যয় হয়ে যেত।

চকোৎ পান নিয়ে রাভাবস্তিগুলিতে প্রায়ই অশান্তি লেগে থাকত। পুরুষরা কোনো কাজের সঙ্গে যুক্ত না হয়ে পরিবারের মহিলাদের উপর শারীরিক ও মানসিক আঘাত করত। রাভা মহিলারা একত্রিত হয়ে চকোৎ তৈরির বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামেন। সামাজিক সংগঠনগুলিও পথে নামেন চকোৎ তৈরির বিরুদ্ধে। যৌথ আন্দোলনের চাপে স্থানীয় পুলিশ-প্রশাসন রাভা বস্তিগুলি থেকে চকোৎ বানানো বন্ধ করে দেন। পুলিশের ভয়ে রাভা বস্তিগুলিতে চকোৎ তৈরি বিলুপ্তির পথে।

একসময় রাভা সমাজে খাদ্যগ্রহণ সংক্রান্ত নানা রকম বিধি নিষেধ ছিল। তাদের সমাজে একসময় গরুর দুধ পান করা ছিল নিষিদ্ধ। দিনে দুবার খাবার নিয়ম ছিল। সূর্য ডোবার সময় তারা কোনো খাবার খেত না। খাদ্য হিসাবে সাধারণত ছিল ডাল, ভাত, মাছ, শাক সব্জি। স্ত্রীলোকেরা মাছ ধরতে যেত নদীর ধারে অথবা গভীর জঙ্গলের ভিতরে কোনো নালা অথবা ডোবায়। চাল পচিয়ে তৈরি চকোৎ (মদ) পান করার রীতি রাভা পরিবারগুলিতে ছিল। সকাল বেলায় তারা চায়ের মত করে চকোৎ পান করত। রাভা পরিবারগুলিতে জন্ম, মৃত্যু, বিবাহের সময় বাধ্যতামূলক ছিল চকোৎ পান। রাভা সমাজের পুরুষরা নানা রকমের পশু শিকার করত কিন্তু কখনো তারা বন্দুক ব্যবহার করত না। বনের মধ্যে জাল পেতে হরিণ, শূকর ধরত। তাদের বেশির ভাগ উৎসবগুলিতে হরিণ, শূকরের মাংসের প্রয়োজন হত।[১৩] সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাদের খাদ্য তালিকার অনেক পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। এই অঞ্চলগুলিতে রাজবংশীদের প্রাধান্য থাকায় রাজবংশীদের খাদ্যাভ্যাসকেই তারা গ্রহণ করেছে।

৩.৭ রাভা গোত্রের বিধিনিষেধ

রাভা সমাজের মানুষ মনে করত, তারা যদি কেউ একই গোত্রের হন তাহলে তারা নিকটাত্মীয়। তাদের পূর্ব পুরুষেরা খুব ঘনিষ্ঠ ছিল এবং তাদের মধ্যে রক্তের সম্পর্ক আছে। এমনকি তারা মনে করত মিত্র গোত্রের মধ্যে রক্তের সম্পর্ক আছে, তাই বিবাহ ছিল নিষিদ্ধ।

রাভা সমাজে কোনো পুরুষ বা রমণী যদি তাদের গোত্রের নিয়ম তোয়াক্কা না করে নিজ গোত্রের বাইরে বিয়ে করে তাহলে তাদের সমাজ তাকে বয়কট করত এবং সালিশি সভা ডেকে তাদের কঠোর শাস্তির বিধান দেওয়া হত এবং তাকে এই ভুল কাজের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করতে হত। তাদের রীতি অনুযায়ী পুরুষ বা রমণীকে অন্য গোত্রের আরেক জনের কাছ থেকে গোত্র ঋণ নিতে হত, তবেই সমাজ তাকে মেনে নিত। তবে যিনি গোত্র দিতেন তিনি মহিলা হবেন এবং তিনি নিঃসন্তান থাকবেন। যিনি এই গোত্র ধার দিতেন তাকে অনেক উপঢৌকন দিতে হত। যিনি গোত্র ধার দিত তার সামনে তিনি কখনো কোনো বড় কথা বলতে পারত না এবং তাকে সম্মান দিয়ে চলতে হত।

যদি কোনো রাভা রমনী অন্য কোন গোষ্ঠীর পুরুষকে বিয়ে করে তাহলে সন্তান-সন্ততি মাতৃবংশেই বড় হবে। রাভা সমাজে একসময় প্রায় দেখা দেখা যেত যে, গোত্র নির্ধারিত হত মাতৃগোত্র অনুযায়ী অর্থাৎ পুত্র বা কন্যা যাই হোক না কেন তাদের গোত্র নির্ধারিত হবে মাতৃ গোত্র অনুযায়ী। অন্যদিকে রাভা জনজাতির কোনো পুরুষ যদি অন্য কোনো গোষ্ঠীর রমণীকে বিয়ে করে তাহলে সে ক্ষেত্রে তার সন্তান-সন্ততিরা শুধুমাত্র পদবিটুকুই পেত।[১৪]

কিন্তু কোন রকম গোত্র পেত না। বর্তমানে রাভা গোত্রের এই নিয়মগুলি রাভা সমাজ থেকে বিলুপ্তির পথে। এখন আর এই গোত্রের নিয়ম মেনে চলতে দেখা যায় না। একসময় তাদের সমাজে গোত্র অনুযায়ী খাদ্যগ্রহণ করার রীতি ছিল। সেই নিয়ম-রীতি এখন আর কেউ মেনে চলে না। একসময় তাদের কিছু গোত্র ও গোত্র অনুযায়ী খাদ্যগ্রহণ সংক্রান্ত বিধিনিষেধ দেখানো হল।

গোত্র	**বিধিনিষেধ**
মৌজিপ্রান	বোয়াল মাছ ভক্ষণ নিষিদ্ধ।
বান্দাধাই	দুধ দই ভক্ষণ নিষিদ্ধ।
নকমান	চকোৎ (মদ) বানানোর ওষুধ তৈরি নিষিদ্ধ।
কাট্রাং	ডাহূক পাখির মাংস নিষিদ্ধ।
পৌম রাই	কচ্ছপ ভক্ষণ নিষিদ্ধ।
মাইসতর	হরিণ ধরা ও মাংস খাওয়া নিষিদ্ধ।
কামা	ইঁদুর ধরা ও খাওয়া নিষেধ।

বান্দা	বেগুন খাওয়া নিষেধ।
চিনচেত	বক মারা, খাওয়া নিষেধ।
থুমরি	ময়ূর খাওয়া নিষেধ।
পমরৈ	দুরা খাওয়া, মারা নিষেধ।
কান্ড্রাং	কোড়া ধরা খাওয়া নিষেধ।[১৫]

৩.৮ রাভা সমাজের কারুশিল্প

আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার জেলায় বসবাসকারী রাভা জনজাতির তৈরি কারুশিল্প একসময় আমাদের রাজ্য, এমনকি রাজ্যের বাইরে খুবেই জনপ্রিয়তা ছিল। কিছু সংখ্যক মানুষ কারুশিল্পকেই পেশা হিসাবে গ্রহন করে। তাদের তৈরি কারুশিল্পের মধ্যে ছিল দেবতার মূর্তি, মাছ ধরার যন্ত্র, বাড়ির সাজানো জিনিস, মুখোশ, বাদ্যযন্ত্র, পলাও (জাখই)। আসামের বিভিন্ন জনজাতির মানুষের বাস। বছরের বেশিরভাগ সময়ই তাদের মধ্যে উৎসব লেগেই থাকত। এই উৎসবগুলির জন্য প্রয়োজন হত বিভিন্ন ধরনের মূর্তি, মুখোশ, বাদ্যযন্ত্রের। আলিপুরদুয়ার জেলার রাভা জনজাতির লাউয়ের ডুগি দিয়ে তৈরি মুখোশ শিল্পের আসামে খুবই চাহিদা ছিল। আধুনিক সংস্কৃতির তাণ্ডবে রাভা সমাজের মধ্যে পালাগান হারাতে বসেছে। পালাগানের জনপ্রিয়তা কমার সঙ্গে সঙ্গে হারিয়ে যেতে বসেছে মুখোশ শিল্প। রাভা জনজাতির শিল্পীরা একসময় পালাগানের জন্য বাঁশ দিয়ে তৈরি বিভিন্ন আকারের মুখোশ বানাত। বাঁশের চাটাই তৈরি করে তার উপরে রং লাগিয়ে মুখোশগুলি তৈরি করত।

একসময় এই পালাগানের জন্যই তৈরি হত ঢোল, বংশী, কালবংশী, বাদাবেং, কালটেপ, হেম, খাম, তারচা, দায়দি, ঝাপখাবা, সানাই, শিঙা, বুবুরিঙা, সহ নানা ধরনের বাদ্যযন্ত্র। এই সব বাদ্যযন্ত্রের তালে রাভা পুরুষ মহিলারা নৃত্য, নাটক, সঙ্গীতের সময় বাঁশের মুখোশ পরে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে।[১৬] এই জেলার রাভা কারুশিল্পীরা লাউয়ের খোল দিয়ে একসময় যে মুখোশ তৈরি করতেন যা আসাম এবং ত্রিপুরায় চাহিদা ছিল। এই মুখোশের আড়ালেই লুকিয়ে থাকত রাভা সমাজের ভালো মন্দের কাহিনি। এই দুই রাজ্যের জন্যই তাদের কারুশিল্প বেঁচে ছিল। বর্তমানে সেই রাজ্যগুলিতেও মুখোশ শিল্পের কদর কমে গেছে।

কারুশিল্পীদের মনে বিভিন্ন দেব-দেবীর মুখোশ বানানোর আগ্রহ আর আগের মত নেই। তাদের এই শিল্প হারিয়ে যাওয়ার অন্যতম কারণ হল, এই অঞ্চলগুলিতে আগের মত আর পূজা-পার্বণ উৎসব হয় না। আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যেও দেব-দেবী, ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা বদলে গেছে। এই অঞ্চলের আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষও কর্ম ব্যস্ত জীবনের সাথে তাল মিলিয়ে চলছে। এই শিল্পকে নতুন প্রজন্মের ছেলেরা পেশা করে নিতে আর আগ্রহী নয়। সভ্যতার যত অগ্রগতি ঘটবে, মানুষের চাহিদারও পরিবর্তন ঘটবে। সেই পরিবর্তিত চাহিদার কাছে প্রয়োজনহীন শিল্পগুলো ক্রমশই হারিয়ে যাবে এটাই স্বাভাবিক।

৩.৯ দেব-দেবী ও পূজাপার্বণ

আলিপুরদুয়ার জেলার রাভা জনজাতির মধ্যে একসময় বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজার প্রচলন ছিল। এই অঞ্চলের রাভা জনজাতির মানুষেরা একসময় সহজেই দেব-দেবীর প্রতি দুর্বল হয়ে পড়ে। কিন্তু বর্তমানে তারা সেই দুর্বলতা অনেকটা কাটিয়ে উঠতে পেরেছে। সচেতন সভ্য সমাজের সাথে তারা বসবাস শুরু করেছে। সময়ের সাথে সাথে আজ সেই সব দেব-দেবী ও পূজার অস্তিত্ব তেমন খুঁজে পাওয়া যায় না। তাদের মধ্যে সাধারণত দুই ধরনের দেব-দেবীর প্রভাব লক্ষ করা যেত একসময়। রাভা সমাজের মানুষেরা দুই ধরনের দেব-দেবীর পূজা করত। তার মধ্যে একটি ভাগে ছিল যে সব দেব-দেবীর পূজা করলে পরিবারের বা সমাজের মঙ্গল হয়। আর অপর ভাগে ছিল যে সব দেব-দেবীর পূজা না দিলে তাদের সমাজে ক্ষতি হয়। এইসব দেব-দেবী তাদের সমাজে অপদেবী বলে পরিচিত ছিল। পূজা না দিলে ওই সকল অপদেবতারা যে কোনো সময়েই ক্ষতি করতে পারে। মঙ্গলকারী দেব-দেবীর তালিকা ছিল, রনতুব, রানের, গাংরাজা, মিচিক রায়, নুর রায় কামাখ্যা, ঋষি, জগ, মহাকাল, বলরাম। অপদেবতাগুলির মধ্যে বুলুয়া রায়, গনচ, পাপিয়া, ভেকাল, জৌরাকাল, প্রেতাত্মা, জোকা-জোকুনি, প্রভৃতি।[১৭]

৩.৯ (ক) কামাখ্যা পূজা

একসময় আলিপুরদুয়ার জেলার কামাখ্যাগুড়ির কামাখ্যা ধামে এই পূজার প্রচলন ছিল। এই পূজাকে কেন্দ্র করে তারা উৎসবে মেতে উঠত। লোকমুখে শোনা যায় যে, আনুমানিক দেড়শত বছর আগে প্রাচীন কামাখ্যা ধামটি গড়ে উঠেছিল। এই প্রাচীন কামাখ্যা ধামটি কিভাবে গড়ে উঠেছিল তা জানা সম্ভব নয়। তবে লোককথা অনুযায়ী কোচবিহার রাজ্যের মহারাজা কোনো একসময় এখানে শিকার করতে এসে এই কামাখ্যা ধামে হাতির সাথে কাদাযুক্ত বিলে ডুবে যান। ওই সময় মা কামাখ্যা হাতি টিকে বিপদ মুক্ত করে দেন এবং মহারাজা প্রানে বেঁচে যান। তারপর তিনি আশ্বাস দেন সেখানে প্রতি বছর মা কামাখ্যার নামে পূজা হবে। পূজার ব্যয়ভার বহন করবে কোচবিহার মহারাজা। রাজন্য প্রথা বিলুপ্তির পূর্ব পর্যন্ত এই নির্দেশ কার্যকরী ছিল।

সেই অঞ্চলের রাভা জনজাতির মানুষ লোকায়ত প্রাচীন বিশ্বাস নিয়ে প্রতি বছর কামাখ্যা মায়ের পূজা করত। এরা কামাখ্যা ও কালীকে অভিন্ন দেবী বলে মনে করত। তাদের সাথে কথা বলে জানতে পেরেছি, মা কামাখ্যার ৬টি মাথা, এবং ১২টি হাত এবং বাহন হল সিংহ। প্রতিবছর আষাঢ় মাসের ১১তারিখে পূজা দেওয়া হত। তাদের লোকাচার অনুসারে জ্যৈষ্ঠ মাসের ১৫ তারিখের আগে থেকেই বাঁশ জাগানো হত। রাভাদের এই পূজায় পাঁঠা, কবুতর, বলি দেওয়ার রীতি ছিল। পূজার উপকরণ হিসাবে তারা আতপ চাল, দূর্বা, ফুল, তুলসী পাতা, সরষের তেলের প্রদীপ, সিঁদুর, ইত্যাদি ব্যবহার করত। এই পূজার শেষে কলার ভেলায় পাঁঠা এবং এক জোড়া কবুতর ভাসিয়ে দেওয়া নিয়ম ছিল। পরবর্তীতে শুধু পায়রা ভাসানো হত। এই পূজা যিনি উৎসর্গ করেন তাকে বলা হত 'মাড়োয়া'। তাদের সাথে কথা বলেই উঠে এসেছে এই জেলার রাভা বসতি অঞ্চলগুলিতে এই পূজার তেমন প্রচলন দেখা যায় না।[১৮]

৩.৯ (খ) বাস্তু দেবী

রাভা জনজাতির মানুষজন সাধারণত দেব-দেবী হিসেবে শিব, পার্বতী, লক্ষী, মাতার আরাধনা করেন। রাভা সমাজের মানুষেরা তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী সাধারণত সর্ব-প্রাণবাদী দেব-দেবীর পূজা-পার্বণ করেন। তাদের মনের বিশ্বাস থেকেই তাদের সমাজে পূজা-পার্বণে জন্ম। আর এই বিশ্বাস থেকেই তারা বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা দিয়ে আসছিল যেমন লাখের ঠাকুর, খোকচি, চকু চিপি, ঋষি রায়, রৌন্তুক, গ্রীমবুডা, কাঁচা-খাইতি, ডলডং, তৌকার-ভুটিয়া, পিড়বায়, ডিব্রী বায়,

এগুলো ছাড়াও বহু সংখ্যক ভূতপ্রেতের পূজা আর সরস্বতী, লক্ষ্মী, শিব, দুর্গা মনসা, মহামায়া কৃষ্ণ, কালী, মদন, ভগবতী ইত্যাদি। তবে এখন এই অঞ্চলের রাভা সমাজের মানুষেরা বর্তমান নানা স্থানে নানা হিন্দু দেবদেবীর পূজা করা হয়।

শালকুমারহাট অঞ্চলের ছোটবস্তির কয়েকজন বয়স্ক মহিলার সাথে কথা বলে তাদের গৃহদেবী 'রৌন্তক রায়' সম্পর্কে জানার চেষ্টা করেছি। তাদের সমাজে এই দেবী 'বাস্তুদেবী' বলে পরিচিত। উত্তর দিকে ঘরের পূর্ব প্রান্তে এককোণে মাটি উচু করে তারা স্থাপন করত বাস্তুদেবী। একটি বড়, একটি ছোট চাল পূর্ণ ঘট বসানো হত বাস্তুদেবী সামনে। চালের উপরে একটি সিঁদুর মাখানো মুরগির ডিম বসানো থাকত বাস্তুদেবী সামনে।[১৯] এই বাস্তুদেবী তাদের সমাজে লক্ষ্মী রূপে পূজিত হত। আবার কোনো কোনো পরিবার অরাধ্যা দেবী, কালী রূপে পূজা করত। বাস্তুদেবী হল লক্ষী-পার্বতীর এক সম্মিলিত যুগল। এই দেবী অত্যন্ত ভয়ংকর ও জাগ্রত বলে তাদের বিশ্বাস। অতি প্রাচীন এবং বংশানুক্রমিক রমণীরাই বাস্তুদেবী স্থাপন করত।

যে রমণীর সময়কালে বাস্তুদেবী স্থাপন করা হত তার মৃত্যুর দিন পর্যন্ত সেই রমণীর দায়িত্বে সংরক্ষিত থাকত। তার জীবন-দশায় ঘরের কন্যা পুত্রবধূ থাকলেও তাদের এই পূজার অধিকার থাকত না। যিনি বাস্তুদেবী প্রতিষ্ঠা করেন তিনি যেদিন মারা যাবেন সেই দিনেই বাস্তুদেবীকে বির্সজন দেওয়ার রীতি প্রচলিত ছিল। পরবর্তীতে যদি তার ঘরে উপযুক্ত বিবাহিত কন্যা থাকে তাহলে গোত্র অনুযায়ী নতুন করে আবার রান্না ঘরে বাস্তুদেবী প্রতিষ্ঠা করা হত। ঘরে যদি উপযুক্ত কন্যা সন্তান না থাকে তাহলে বাড়ির বড়ো পুত্রবধূ বাস্তু দেবী স্থাপন এবং পূজা করত। বাস্তুদেবী পূজার জন্য চকোৎ (মদ) এবং শূকর মাংস নিবেদন করা ছিল আবশ্যক। তবে শূকর বলি দেওয়ার পর মাথাটি মূল আসনে বসানো থাকত এবং পূজা করত পুরোহিত। পূজার শেষে শূকরের মাথাটি কুলোতে নিয়ে মাথার উপরে রেখে উলুধ্বনি সহকারে নিয়ে যাওয়া হত বাস্তুদেবীর ঘরে। রাভা পরিবারে বিবাহের সময় রীতিনীতি মেনে বাস্তুদেবীর পূজা দেওয়া হত। বিবাহের একদিন পূর্বে উঠোনের পূর্ব দিকের একপ্রান্তে ত্রি-শাখা যুক্ত একটি গাছের ডাল পোতা হত। এই গাছের আগা থেকে গোড়া পর্যন্ত পইতে স্বরূপ লম্বা সুতো ঝুলানো থাকত এবং সে সময় বিভিন্ন বাদ্যযন্তের সাহায্যে মুখরিত হয়ে উঠত বরণ উৎসব। পূজায় নিবেদিত প্রসাদ সবাইকে বিতরণ করা হত। আর এই দিনেই বৃদ্ধ-বৃদ্ধা তাদের মনের আবেগ প্রকাশ করে বিভিন্ন নৃত্য-গীতের মধ্যে দিয়ে।

৩.৯ (গ) নুর বায়

ক্ষেত্রসমীক্ষা থেকে জানতে পেরেছি রাভা সমাজে একসময় মঙ্গলকারী দেবী বলে পরিচিত ছিল নুর বায়। তাদের সমাজে বিশ্বাস ছিল যে নবজাত শিশু এবং প্রসূতির মঙ্গল করতে পারে নুর বায় দেবী। তাই তারা এই দেবীকে খুশি করার জন্য পূজা দিত। পূজার সময় কামনা করত যাতে সন্তান জন্মগ্রহন কালে এবং প্রসূতি সন্তান জন্ম দেওয়ার সময় উভয়েই সুস্থ থাকেন এবং কোনোরকম সমস্যায় যেন না পড়েন। এই পূজা দেওয়ার মূল কারণ ছিল, শিশুর জন্মের পর শিশু এবং মা যেন সুস্থভাবে জীবনযাপন করতে পারে এবং কোনোরকম অপদেবতার কুনজরে যেন না পড়ে। শিশু জন্মের পর থেকে যদি বেশি কান্নাকাটি করে বা তার গায়ের রং বারবার পরিবর্তন হয় তাহলে তারা মনে করে নুর বায়ের নামে মানত করতে হবে।

আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহার জেলায় বসবাসকারী রাভাদের মধ্যে অধিকাংশ মানুষ একসময় নুর বায়ের পূজা করত নিজেদের সুরক্ষিত রাখার জন্য। নুর বায় পূজায় কোনো তিথি বা দিনক্ষণ ছিল না। সপ্তাহের যে কোন দিনে এই পূজা হত। তবে দিনক্ষণ স্থির না থাকলেও সন্ধ্যা বেলায় পূজার প্রচলন ছিল এবং যে ঘরে শিশু ও প্রসূতি থাকত সেই ঘরেই পূজার থান নিদিষ্ট করা হত। থানটি থাকত ঘরের পূর্বদিকে। থানের দুই পাশে দুটি পাত্রে চকোৎ ও জল রাখা হত। শিশু ও তার মাতাকে থানের সামনে অঞ্জলি দিতে হত। দেবীর উদ্দেশ্যে পায়রা কেটে তার রক্ত চারিদিকে ছড়িয়ে দেওয়ার নিয়ম ছিল। পায়রার মাংস ভোগ হিসেবে ব্যবহার করত, যাতে শিশুকে কোনরকম দুরারোগ্য-ব্যাধি আক্রান্ত করতে না পারে। পূজারি শিশুর কানে ও নাকে তিনবার করে ফুঁ দিত এবং ধূপ-ধূনার ধোঁয়া শিশুর কানে ও নাকে প্রবেশ করাত, যাতে রোগ ব্যাধির প্রকোপ দূর হয়। পূজা শেষে পরিবারের সকলে প্রসাদ গ্রহণ করতে হত। নুর বায় আক্রান্ত শিশুর চোখের দৃষ্টি আকাশের দিকে থাকে বলে প্রচলিত ভাষায় নুর বায়কে একসময় আকাশ কামিনী বলা হত।[২০]

৩.৯ (ঘ) বুলুয়া বায়

রাভা সমাজের মানুষেরা এই দেবতাকে অপদেবতা বলে মনে করত। তাদের মনে বিশ্বাস ছিল এই অপদেবতা গভীর জঙ্গলে বাস করে এবং এই অপদেবতা যে কোনো ও সময় মানুষের ওপর ভর করতে পারে। স্ত্রী-পুরুষ কোনো ভেদাভেদ নেই এই অপদেবতার কাছে। ক্ষতিকারক দেবতা বলে পরিচিত ছিল। এই দেবতাকে নিয়ে তাদের মনে একটা ভীতি সবসময় কাজ করত। যদি

কোনো পুরুষ বা স্ত্রী উপরে এই দেবতা ভর করত তাহলে তাদের মধ্যে নানা রকম লক্ষণ দেখা যেত। যেমন- কখনো কাঁদে, কখনো হাসে, কখনো আবার মানুষকে গালিগালাজ করে, অনেক সময় নিজের আত্মীয়-স্বজন এমনকি নিজের পরিবারের মানুষকে চিনতে পারে না। ঠিক সময়ে খাবার খাওয়া স্নান করা সব কিছু ভুলে যেত। পাগলের মতো রাস্তাঘাটে ঘুরে বেড়ায় এবং শিশুর মত আচার আচরণ করে, মানুষকে গালি গালাজ করে। এসব লক্ষণ কারো মধ্যে দেখা দিলে তারা ওঝা (তাদের ভাষায় হুজি) ডেকে আনত। ওঝা এসে গোনা-পড়া করে মাটিতে আঁক-জোঁক করত। কাঠি দিয়ে মেপে দেখত যে বুলুয়া ধরেছে কিনা। কিন্তু তিনি যদি মনে করত বুলুয়া ধরেছে, তাহলে মানা-চিনা করার পরামর্শ দিত পরিবারের লোকদের। পরিবারের ইচ্ছে থাকলে তিনি নিয়মিতভাবে জলপড়া, তেলপড়া দিয়ে রোগের চিকিৎসা করত। এই গোনা-পড়াকে রাভা ভাষায় বলা হত বায়-নইকা অর্থাৎ দেও দেখা। বুলুয়া বায়ের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য জঙ্গলের কাছাকাছি এর উদ্দেশ্যে পূজা হত।[২১]

৩.৯ (ঙ) গাংরাজা

রাভা সম্প্রদায়ের মানুষেরা কৃষিকাজের জন্য গাংরাজা দেবতার পূজা করত। যখন ক্ষেতে হৈমন্তী ধানের থোড় আসত তখন রাভা সম্প্রদায়ের কৃষকরা এই দেবতার পূজা করত। ধানচাষের জমিতে সন্ধ্যা বেলায় এই পূজা দেওয়ার রীতি ছিল। আশ্বিন মাসের শেষ দিকে এই পূজা দেওয়ার প্রথা ছিল। ক্ষেতের একটি কোণে চারটি পাট শলা পুঁতে দিয়ে মাচা তৈরি করা হত। সেই মাচার উপর দুটি কলার খোলায় আতপ চাল ও কলা দেওয়া হত। এই পূজায় হাঁসের মাংস রান্না করে চকোৎ (মদ) সহ গাংরাজার উদ্দেশ্যে নিবেদন করা হত। তাদের সমাজে বিশ্বাস যে এই দেবতার পূজা করলে ফসল ভালো হবে এবং পোকামাকড়ের হাত থেকে ফসল রক্ষিত থাকবে। এই বিশ্বাস আর রাভা সমাজে দেখা যায় না।[২২]

৩.৯ (চ) ঋষি-জগ

রাভা পরিবারে বিয়ের আগে এই দেবতার পূজা দেওয়া রীতি ছিল। কেউ কোনো পাপ কাজ করলে এই দেবতার পূজা দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করতে হত। বৈশাখ মাসে এই পূজার আয়োজন করা হত। আসলে রাভা সমাজে মানুষের মনে এক ধরনের বিশ্বাস আছে যে তারা এই দেবতার পূজা

করলে তাদের বৈবাহিক জীবনে কোনো সমস্যায় পড়তে হবে না। রাভা সমাজ তাদের অন্যান্য দেব-দেবীর থেকে এই দেবতাকে বেশি গুরুত্ব দিত। যদিও এই দেবতার কোন মূর্তি ছিল না। ঋষিকে শিব এবং জগকে কালী বলা হত। যে ঘরে রাভারা বাস করে সেই ঘরের মাচার ওপরে যেখানে গৃহদেবী রূন্তক-এর প্রতীক মাটির কলসি থাকে সেখানেই এই দেবতার পূজার স্থান নির্দিষ্ট থাকত। এই পূজার জন্য নানা রকম উপকরণ ব্যবহার করা হত। পূজার স্থানে দুই ঝুকি ষোলটিয়া মনুয়া কলা, আতপ চাল, দই-চিরে, চকোৎ, চিকা দেওয়া হত। মুরগি ও শূকর বলি দিয়ে উৎসর্গ করা হত। এই পূজায় গৃহের মঙ্গল হয় এবং আগামী দিন শুভ হয় এমন বিশ্বাস তাদের মনে ছিল। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই বিশ্বাসে চির ধরেছে। এই দেবতার পূজার প্রচলনও আর তেমন দেখা যায় না।[২৩]

৩.৯ (ছ) জোকা-জুকিনি

একসময় অপদেবতা সম্পর্কে রাভা সমাজের মনে একটা অন্ধ কুসংস্কার ছিল। অপদেবতার হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য তারা নানারকম কৌশল অবলম্বন করত। অনেক নিয়ম-শৃঙ্খলা মধ্য দিয়ে জীবন কাটাত। তবুও কোনো কারণবশত নিয়ম শৃঙ্খলার ঘাটতি হলে অপদেবতার সম্মুখীন হতে হত। রাভা সমাজে এমনই এক অপদেবতা হল জোকা-জুকিনি। তারা মনে করে এই অপদেবতা বেশি ক্ষতি করে না। মুড়ি ও চিড়ার নাড়ু দিয়ে পূজা দিলেই খুশি থাকে। তাদের সাথে কথা বলে জানতে পেরেছি 'জোকা' নয় প্রকার, তার মধ্যে শিব জোকা এবং কাল জোকার পূজা তারা দেয়। এদের প্রভাবে ছোট ছোট শিশুরা চার মাস থেকে আট-দশ মাস বয়সের শিশুরাই আক্রান্ত হয়। যদি শিশুর কাশি, বমি, জ্বর পেটের ব্যথা, পাতলা পায়খানা প্রভৃতির উপসর্গ দেখা দেয়, তাহলে তারা বুঝতে পারত শিশুর উপর 'জোকা'র দৃষ্টি রয়েছে। এই অপদেবতার দ্বারা শিশু যদি আক্রান্ত হত তাহলে কাশি, বমি, জ্বর, পেটের ব্যাথা, পাতলা পায়খানা মত নানা রকমের উপসর্গ দেখা দিত। যদি এইসব উপসর্গ দেখা দিত তবে নির্ঘাত বুঝত যে শিশুটির উপর 'জোকা' অপদেবতার দৃষ্টি পড়েছে। তখন 'হুজি'র নির্দেশে মুড়ি ও চিড়ার নাড়ু মানত দিতে হত।[২৪] রাভা সমাজ এই বিশ্বাস নিয়ে মুড়ি-নাড়ু মানত করত। মানতের পর দেখা যেত যে শিশুটি রোগ-ব্যাধি থেকে কিছুদিনের মধ্যেই সেরে উঠেছে। রাভা সমাজে এটা প্রচলিত ছিল যে 'শিব জোকা'র থেকে 'কালজোকা' একটু বেশি রাগী। এই অপদেবতাকে সন্তুষ্ট করার জন্য মানতের পরিমাণ ছিল বেশি। একজোড়া পায়রা, একটি বোয়াল মাছ পোড়া মানত করা হত। বোয়াল মাছকে

পুড়িয়ে বাঁশের কঞ্চির সাথে গেঁথে পূজার স্থানে পুঁতে দেওয়া হত। তাদের মনে বিশ্বাস ছিল যে, এই মানতের জন্য শিশু ভালো হয়ে উঠবে এবং অন্য কোনো দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা থাকবে না। একসময় এইসব অপদেবতার নাম প্রায় রাভা সমাজে শোনা যেত। বর্তমান রাভা সমাজকে এই অপদেবতার প্রতি বিশ্বাস রাখতে দেখা যায় না। বর্তমানে সেখানকার মানুষও কুসংস্কার থেকে বেরিয়ে এসেছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তারাও এখন বিজ্ঞান নির্ভর হয়েছে। বদলে গেছে তাদের সমাজ ব্যবস্থা, আর একারণেই কুসংস্কারগুলো হারিয়ে যাচ্ছে তাদের সমাজ থেকে।

৩.৯ (জ) দেকাল

রাভা সমাজে যে সব অপদেবতার নামের সাথে আমরা পরিচিত সেই সব অপদেবতাগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল দেকাল। তাদের সমাজে মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত ছিল যে, এই অপদেবতা কারোর উপর ভর করলে নানা রকম সমস্যার মধ্যে পড়তে হয়। এই অপদেবতা মহিলাদের উপর বেশি ভর করে। এই অপদেবতা কারো উপর ভর করলে তিনি অসহ্য পেট ব্যথার যন্ত্রনা অনুভব করেন। যন্ত্রণায় কাতর হয়ে পেট ফুলে যায়। এই লক্ষণ দেখা দিলে তারা মনে করত দেকাল অপদেবতা ভর করেছে। সদ্য বিবাহিত মহিলাদের উপর এই অপদেবতা বেশি ভর করে বলে তাদের মনে বিশ্বাস ছিল। এই অপদেবতার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তারা 'হুজি'র (ওঝা) পরামর্শ নেন। 'হুজি' নতুন বাঁশের ঝাঁটার কাঠি দিয়ে পেটের উপর মাপজোক নিয়ে বুঝতে পারত যে অপদেবতা ভর করেছে কিনা। তিনি যদি বুঝতে পারেন অপদেবতা ভর করেছে তাহলে তিনি পূজার আয়োজন করার জন্য নির্দেশ দিতেন। রোগীর আত্মীয়-স্বজন পূজার আয়োজন করত। মুরগি ও শূকরের নাড়ি-ভুড়ি এ দেবতার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হত। তারপর দুটি পাত্রে চকোৎ (মদ) রেখে অপদেবতা দেকালকে আহ্বান করা হত।[২৫]

৩.৯ (ঝ) হাসংবাই

রাভা সমাজে এই দেবী উপকারী দেবী বলে পরিচিত ছিল। আলিপুরদুয়ার জেলার রাভা বসতি অঞ্চলগুলিতে এই দেবীর একসময় খুবই প্রভাব লক্ষ্য করা যেত। কেননা এই অঞ্চলের মানুষেরা অলস এবং অশিক্ষিত হওয়ায় তাদের মনে একধরণে কুসংস্কারবোধ বিরাজ করত। দিনের

বেশিরভাগ সময়ই তারা চকোৎ (মদ) পান করে অনিয়মিত জীবন যাপন করত। এই কারণে তাদের কে কলেরা, আমাশয়, বসন্ত, প্রভৃতি জটিল রোগের দ্বারা আক্রান্ত হতে হত।

এই সব রোগ থেকে নিরাময়ের জন্য তারা 'হাসংবাই' দেবীর পূজা করত। তাদের মনে বিশ্বাস ছিল যে এই দেবী খুবই জাগ্রত এবং এই দেবীকে খুশি করতে পারলে রোগ ব্যাধি থেকে সহজে মুক্তি পাওয়া যাবে। পূজার উপকরণ হিসেবে তারা একটি বরাহ এবং দুই তিনটি কুক্কুট এই দেবীর উদ্দেশ্যে বধ করত। কিন্তু বর্তমানে আলিপুরদুয়ার জেলার শালকুমারহাট অঞ্চলের রাভা বস্তিগুলিতে এই দেবীর প্রভাব তেমন চোখে পড়ে না।[২৬]

৩.৯ (ঞ) দরমংরাই

বনাঞ্চলে বসবাসকারী রাভারা বেশির ভাগেই কর্মহীন এবং অলস প্রকৃতির হয়। পরিশ্রম না করেই তারা আর্থিক সমৃদ্ধিশালী হওয়ার স্বপ্ন দেখতেন। তারা মনে করেন যে 'দরমংরাই' ধন ও স্বাস্থ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। দরমং নামক পাহাড়ে এই দেবীর বাসস্থান বলে তাদের মনে বিশ্বাস ছিল তাদের সমাজে বিবাহের জন্য যে শূকর বলি দেওয়া হত, তার মধ্যে প্রথম শূকরটি এই দেবতার নামে উৎসর্গ করা হত। শূকরের মাংস প্রসাদ হিসেবে ব্যবহার করা হত। কিন্তু পরবর্তীতে তারা বুঝতে পেরেছে যে কর্মই সফলতার মূল চাবিকাঠি। আর এই জ্ঞান বৃদ্ধির সাথে সাথে এই দেবতা সম্পর্কে অন্ধবিশ্বাস অনেকটাই কেটে গেছে। সময়ের সাথে সাথে মানুষের মন থেকে এই দেবতাও বিলুপ্তি ঘটেছে।[২৭]

৩.১০ লোকনৃত্য

উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহার জেলায় রাভা জনজাতির মানুষ একসময় খুবই উৎসাহের সাথে বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করত। রাভাদের লোক-জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে ছিল নাচ-গান। পুজা-পার্বণ, জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ, জীবনের উত্থান-পতন, ভালোবাসা দুঃখ সব কিছুতেই ছিল নাচের অনুষ্ঠান। নৃত্য-গীত রাভা সমাজের প্রায়ই লেগে থাকত। নৃত্য-গীত তাদের সমাজে কখনো কোনও অবস্থাতেই থেমে থাকত না। পূজা-পার্বণ, সামাজিক ও পারিবারিক উৎসবে তো বটেই, মৃতদেহ দাহ, এমনকি শ্রাদ্ধের মতো করুণ অনুষ্ঠানেরও নৃত্যগীত চলতেই থাকত। সামগ্রিক জীবনের ভালো মন্দ, সুখ দুঃখের সঙ্গে নৃত্যকে

আপন করে নিয়েছে। তাদের ভাষায় নাচকে তারা বলত 'বসিনি'। মৃতদেহ সৎকার, শ্রাদ্ধ, অনুষ্ঠান, দেব-দেবীর উপাসনা, বিবাহ, ঋতু উৎসব, সবকিছুতেই রাভা মহিলাদের মিলিতভাবে যোগদান করতে দেখা যেত। রাভা মহিলারা দলযোগে নৃত্য-অনুষ্ঠান অংশ নিত। তাদের মত নৃত্য প্রিয় জাতি সহরাচর দেখা যায় না। অনিয়মিত ভাবে জীবন যাপনের জন্য তাদের ঘরে অভাব-অভিযোগ, অসুখ-বিসুখ ইত্যাদি নিত্যসঙ্গী লেগেই থাকত। কিন্তু অভাব থাকা সত্ত্বেও আনন্দ উৎসব থেকে তারা পিছিয়ে থাকেনি। পূজা-পার্বণ, সামাজিক ও পারিবারিক উৎসব থেকে শুরু করে জন্ম, মৃত্য, বিবাহ, এমনকি শ্রাদ্ধের মত করুণ অনুষ্ঠানেও তাদের যৌন ইঙ্গিতময় নৃত্যগীত চলতেই থাকত। আর এই নৃত্য-গীতে মহিলারা চকোৎ পান করে নৃত্যে অংশ নিত। পরিবারের বাচ্চা, মহিলা শিশু, বয়স্করা গ্লাসে গ্লাসে চকৎ পান করত কিন্তু মাতাল হতে কাউকে দেখা যেত না। মৃতদেহ শ্মশানে নিয়ে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত পুরুষ ও মহিলারা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেই যৌথ নৃত্যে অংশগ্রহণ করত। শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানে রাভা পুরুষরা হ্যাম, কালবাঁশি, গোমান, বাফক, ডিংডং ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র বাজাত এবং মহিলা এই বাদ্যযন্ত্রের তালে তালে নৃত্য-গীতে অংশ নিত। মৃতদেহ শ্মশানে নিয়ে যাওয়ার সময় উঠোনে গোবর জল ছিটিয়ে দিয়ে সেই গোবর জলের উপর নৃত্য করত রাভা পুরুষরা। এই নাচকে তারা বলত 'মৈররায় চাঙ্গি' তাদের বিশ্বাস যে এই নাচ ব্যতিরেক মৃত ব্যক্তির সদ্গতি হয় না। উত্তরবঙ্গের আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার জেলার রাভা জনজাতির মানুষের জীবনচর্যায় নৃত্যের স্থান অতি নিবিড়। নৃত্যকে তাদের ভাষায় বলত 'বসিনি'।[২৮] তাদের নৃত্যের মধ্যদিয়ে তাদের শ্রম, আনন্দ, বিরহ-মিলনের বিচিত্র চিত্র প্রকাশিত হত। যদিও তাদের সমাজ থেকে নৃত্য প্রায় অবলুপ্তির দিকে।

৩.১০ (ক) হাঙ্গার সেনি নৃত্য

ভারতের অন্যান্য জনজাতিদের মতোই রাভা সম্প্রদায়ের মানুষরা কৃষিকর্মকেই জীবিকার্জনের একমাত্র উপায় হিসেবে গ্রহণ করেছে। হাঙ্গার সেনি হল রাভা সমাজের এক ধরনের বীজ বপনের নৃত্য। রাভাদের লোকগীতি, লোককাহিনি, ও লোক নৃত্যে তার বহু নিদর্শন আছে। নতুন ধানের চারা লাগানোর সময় এই ধরণের নৃত্য করা হত। আসলে তারা মনে করে যে এই নৃত্য পরিবেশন করলে লক্ষ্মী দেবী খুশি হয় এবং রোগ প্রতিরোধের হাত থেকে ফসলকে রক্ষা করে। তাই তারা এই নৃত্যের মধ্য দিয়ে দেবীকে খুশি করত। এই নৃত্যে মেয়েরা অংশগ্রহণ করে। পুরুষের এই নৃত্যে তেমন কোন ভূমিকা থাকে না। অকর্ষিত জমিতে আগাছা নির্মূল, কোদাল দিয়ে কোপানো

ভূমিতে পূজা ও ফসলের বীজ ছড়ানোর দৃশ্যের ছন্দময় রূপায়ন হল এই নৃত্যে।[২৯] যৌথ শ্রমের সংস্কৃতি এই নাচের ছিল মূল কথা। উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ রাভা বসতি অঞ্চলগুলিতে এই নৃত্য আর চোখে পড়ে না।

৩.১০ (খ) নাকচেং রেণী নৃত্য

রাভা জনজাতির মানুষের প্রিয় খাবার হল ভাত, মাছ। তারা নিত্যদিন খাবারের পাতে মাছ রাখত। রাভা পুরুষ মহিলাা মাছ ধরায় বিশেষ উৎসাহী ছিল। তারা কখনও একা মাছ ধরতে যেত না। মাছ ধরার জন্য রাভা পুরুষ মহিলা দল বেঁধে নদী বা ঝর্ণায় যেত। যাতাযাতের পথে এবং মাছ ধরার সময় নৃত্যগীতের মাধ্যমে আমোদ-প্রমোদ করত। মাছ ধরাকে তারা একপ্রকার খেলা ও বিনোদন বলে মনে করত। রাভা বসতি অঞ্চলগুলিতে চিংড়ি মাছ পাওয়া যেত। এই চিংড়ি মাছ পাওয়ার আনন্দে মেয়েরা খুশি হয়ে এক ধরেনের নৃত্যে অংশ গ্রহণ করত। তাদের ভাষায় যা নাকচেং নৃত্য নামে পরিচিত। মাছ ধরার সময় মেয়েরা কোমরে খলই বেঁধে হাতে জাল নিয়ে মাছ ধরার এমন নৃত্য মেতে উঠত।[৩০] এখন পরিবারের পুরুষেরা মাছ ধরতে গেলেও মহিলাদের আর মাছ ধরতে দেখা যায় না। সময়ের সাথে তাই এই নৃত্যও হারিয়ে গেছে।

৩.১০ (গ) কা-তাঙ্গি নৃত্য

শালকুমারহাট অঞ্চলের সুরিপাড়ার কয়েকজন বয়স্ক মহিলার সাথে কথা বলে জানতে পেরেছি এই নৃত্য অনুষ্ঠিত হত বৈশাখ মাসে। রোগ থেকে মুক্তি লাভের আশায় রাভা সম্প্রদায়ের মহিলারা এই নৃত্যে অংশ নিত। তাদের সমাজের মানুষের মনে বিশ্বাস ছিল যে, এই নৃত্যে দেবতারা খুশি হলে তাদের সাধারণ জীবনযাপনে কোনো ব্যাঘাত ঘটাবে না। এই নৃত্যের মধ্য দিয়ে তারা দেব-দেবীকে সন্তুষ্ট করত। শালকুমারহাট অঞ্চলে বসবাসকারী রাভা জনজাতির মানুষের মনে সবসময় একধরনের ভয়-ভীতি কাজ করত। তারা ছিল বেশির ভাগই অলস প্রকৃতির তাই দেব-দেবীর প্রতি তাদের ছিল অন্ধবিশ্বাস। প্রত্যেক বছর বৈশাখ মাসে দেব-দেবীদের সন্তুষ্ট করার জন্য এই ধরনের নৃত্যের আয়োজন করত।[৩১] গ্রামের মহিলারা একত্রিত হয়ে এই ধরনের নৃত্যে অংশগ্রহণ করত। কিন্তু বর্তমানে উন্নত সমাজ ব্যবস্থায় এই ধরনের নৃত্য আর দেখা যায় না।

৩.১০ (ঘ) চোর খেলেয়ী

কার্তিক মাসের অমাবস্যায় কালীপূজা উপলক্ষে ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা চোর ও ভালুকের দুটি পৃথক পৃথক মুখোশ ব্যবহার করে লোকের বাড়িতে ঘুরে ঘুরে মাখনা তুলত। মাখনা তোলার সময় ছেলে-মেয়েরা একধরনের নৃত্য করত যা তাদের ভাষায় 'চোর খেলেছি'। এই নৃত্য করার সময় ছেলেরাই মেয়েদের শাড়ি পড়ে হাতে বাঁশের লাঠি নিয়ে যুদ্ধ সহযোগে নৃত্য করতে থাকে। এই নাচে দুটি মুখোশ ব্যবহার করত। একটি ভালুকের মুখোশ আরেকটি চণ্ডীর মুখোশ। রাভা সমাজের মানুষেরা মনে করত যে এই নৃত্যের সময় ছেলেরা গাছে লাঠি দিয়ে আঘাত করলে গাছে ফল বেশি হয়। সাধারণত নৃত্যের সময় আম, কাঁঠাল লেচু, নারকেল, জাম গাছে লাঠি দিয়ে আঘাত করা হত।[৩২] এই বিশ্বাস তাদের সমাজে একসময় ঘরে ঘরে ছিল। কিন্তু বর্তমানে তারাও নিজেদের বিজ্ঞান নির্ভর আলোয় নিজেদের আলোকিত করায় তাদের মন থেকেও এই সব অন্ধ বিশ্বাসের অবসান ঘটেছে।

৩.১০ (ঙ) মাক্‌পর বসিনি

আলিপুরদুয়ার জেলার রাভা বসতি অঞ্চলগুলিতে একসময় ধুমধাম করে কালীপূজা হত। তারা দল বেঁধে পাড়ায় পাড়ায় একজোট হয়ে কালীপূজার আনন্দে মেতে উঠত। এই পূজার জন্য সমস্ত খরচ তারা পূজার কয়েক দিন আগে থেকে সংগ্রহ করত। মাক্‌পর বসিনি নৃত্য তাদের সমাজে ভালুক নাচ নামেও পরিচিত ছিল। ভালুকের মুখোশ পরে, কলাপাতা বা পাটের আঁশ দিয়ে রোমশ ভালুক সেজে পাঁচ-ছয় দিন লোকের বাড়ি ঘুরে ঘুরে মাখনা তুলে কালীপূজার অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা হত। এই নৃত্যে রাভা পরিবারের বাড়ির উঠোনের চারিদিকে ঘুরে ঘুরে এগিয়ে পিছিয়ে চক্রাকারে ঘুরে তাল, লয়, ছন্দের দক্ষতা দেখিয়ে নৃত্য পরিবেশিত হত। কার্তিক মাসে কালী পূজা উপলক্ষে এই নৃত্য দেখা যেত রাভা গ্রামগুলিতে।[৩৩] এই ধরনের নৃত্যকে তাদের ভাষায় 'মাক্‌পর বসিনি' বা ভালুক নাচ বলত। তবে এখন এই নৃত্য সহযোগে মাখনা তোলার প্রচলন রাভা সমাজে দেখা যায় না।

৩.১০ (চ) মেরবার চাঙ্গি

এই অঞ্চলের রাভা সম্প্রদায়ের কিছু মানুষের সাথে কথা বলে জানতে পারি তাদের পরিবারের কোনো সদস্য মারা গেলে তাকে সম্মান জানানোর জন্য একধরণের নৃত্যের প্রচলন ছিল যা তাদের ভাষায় 'মেরবার চাঙ্গি' নৃত্য নামে পরিচিত ছিল। তাদের পরিবারের পুরুষ-মহিলারা যৌথভাবে এই নৃত্যে অংশ গ্রহণ করত। মৃতদেহ সৎকার ও শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের সময় নৃত্য পরিবেশিত হত। কিন্তু তাদের সমাজের প্রচলিত নিয়মানুযায়ী এই নৃত্য অন্য কোনো অনুষ্ঠানে পরিবেশিত করা যেত না। কেবলমাত্র মৃত ব্যক্তিকে সম্মান জানানোর জন্যই তাদের সমাজে এই ধরনের নৃত্যের প্রচলন ছিল। তাদের বিশ্বাস ছিল যে এই নৃত্য পরিবেশিত হলে মৃত ব্যক্তির আত্মা শান্তি পাবে। তাদের পরিবারে তিনি পুনরায় ফিরে আসতে পারেন এই বিশ্বাস তাদের অন্তরে ছিল। তাই তারা মৃতদেহ সৎকার, শ্রাদ্ধ-অনুষ্ঠানের সময় নৃত্যের আয়োজন করত।[৩৪] কিন্তু এখন তাদের সেই বিশ্বাসের অবসান ঘটেছে। পুনঃজন্মে তাদের আজ বিশ্বাসী নেই। তাই তাদের সমাজ থেকে হারিয়ে যাচ্ছে এই নৃত্য।

৩.১০ (ছ) হাণ্ডা-বারু

আলিপুরদুয়ার জেলায় বসবাসকারী রাভা সম্প্রদায়ের মানুষরা জীবন রক্ষার তাগিদে নৃত্যের মধ্যে দিয়ে যুদ্ধের প্রশিক্ষণ নিত। এই প্রশিক্ষণ নেওয়ার জন্য যে নৃত্যের প্রচলন তাদের সমাজে ছিল তাকে বলা হত 'হাণ্ডা-বারু'। কেননা বনাঞ্চলের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বসবাসকারী রাভা সম্প্রদায়ের মানুষদের নিত্যদিন বন্যপ্রাণীর সাথে সংগ্রাম করে বেঁচে থাকতে হত। তাই তারা যুদ্ধের প্রশিক্ষণ নিত এই নৃত্যের মধ্য দিয়ে। দল বেঁধে পুরুষদের এই নৃত্য অংশগ্রহণ করতে দেখা যেত। কিন্তু এখন বনাঞ্চলগুলিতে যথেষ্ট সংখ্যক বনকর্মী নিয়োগ করায় বন্যপ্রাণীরা বনের বাইরে তেমন আসতে পারে না। বন্যপ্রাণীদের সাথে তাদের আর সংঘর্ষও বাধে না। তাই তাদের সমাজে এই লোকনৃত্যের মধ্যে দিয়ে আর প্রশিক্ষণ নেওয়ার প্রয়োজন পড়ে না। এই কারণেই এই নৃত্যের অবসান ঘটেছে।[৩৫]

৩.১০ (জ) বসর পিদান

রাভা জনজাতির মানুষেরা উৎসব প্রিয়। তারা দলবদ্ধভাবে বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানে একত্রিত হয়ে সামাজিক আনন্দে মেতে উঠে। তাদের কাছে এমনই এক উৎসব 'বসন্ত উৎসব'। এই উৎসবে তারা গায়ে রং মেখে আনন্দে মেতে উঠে। এই উৎসবে তারা দলবদ্ধ ভাবে যে নৃত্যে অংশগ্রহণ করে তাদের ভাষায় বলা হত 'বসর পিদান'। বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র সহযোগে তারা এই নৃত্যে অংশগ্রহণ করত।[৩৬] কিন্তু বসন্ত উৎসব থাকলেও এই নৃত্যের তেমন প্রচলন দেখা যায় না।

৩.১১ লোকগীত

আদিম মানুষের কাছে সঙ্গীত ছিল জীবনের এক অপরিহার্য অঙ্গ। সঙ্গীতের মধ্যে দিয়েই তাদের জীবনের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, ভালোবাসা প্রকাশিত হত। প্রত্যেক জনজাতিরও নিজস্ব লোকগীত রয়েছে। লোকগীতগুলির জন্ম হয়েছে জনসমাজের মধ্যে থেকেই। স্বভাবতই লোকগীতের মধ্যে দিয়েই ওঠে আসে একটি জাতির বা একটি জনজাতির জীবনের গান। লোকগীত হল গ্রামীণ জনসমাজের প্রাত্যহিক জীবনের একটি অপরিহার্য উপাদান। লোকগীতের রচয়িতার আলাদা কোনো মর্যাদা নেই। লোকগীত আসলে জনসমাজেরই সম্পত্তি। মানুষের জীবনের সঙ্গে এর নিবিড় সম্পর্ক। লোকগীতের মধ্যেই রয়েছে একটি গ্রামীণ জনসমাজের চেতনার অভিব্যক্তি এবং বৈশিষ্ট্য। একথা বলা যায় যে জীবনের প্রয়োজনেই লোকগীতের জন্ম। যে সমাজ তাদের নিজেদের মধ্যে একটি একাত্মতা উপলব্ধি করে তাদের মধ্যে লোকগীতের প্রচলন বেশি দেখা যায়। একটি জনজাতিকে চিহ্নিত করা যায় লোকগীতের মধ্যে দিয়ে। কেননা মাটির অতিনিকট থেকে লোকগীতগুলির জন্ম। সেখানে থাকে একটি জাতির জীবনধারণ, তাদের আচার-আচরণ, পূজা-পার্বণ, বিশ্বাস, সংস্কার, রীতি-নীতি, ভালো-মন্দ, সুখ-দুঃখের কাহিনি। অর্থাৎ সরল প্রাণের কথা বলাই লোকগীতগুলির আসল উদ্দেশ্য এবং বৈশিষ্ট্য। আশ্‌রাফ সিদ্দিকী তাঁর *লোক-সাহিত্য* গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে লোকগীতগুলির বিভিন্ন ভাগ দেখিয়েছেন যেমন (ক) আঞ্চলিক গীতি – যা অঞ্চল বিশেষে বিশেষভাবে প্রচলিচ। (খ) ব্যবহারিক গীত – জন্ম, বিবাহ উৎসব ইত্যাদি উপলক্ষে গীত। (গ) কর্ম-সংগীত এবং শ্রম-সংগীত – নানারকম কাজের সময় যে গীতগুলি গাওয়া হয়। (ঘ) প্রেম গীত – বিরহিণী নারী ও বিরহী পুরুষের নানা হৃদয় বেদনা ও চিরন্তন

প্রেম -সম্ভাষণ যে গীতে প্রকাশিত হয়। (ঙ) বারোমাসী - নারীর বারো মাসের বিরহ-বেদনা যে সব গানে প্রকাশিত হয়। (চ) হাসির গীত – আনন্দ, হাসি বিষয়ক গীত।[৩৭]

একটি জাতির সামাজিক জীবনে লোকগীতগুলি যেন তাদের সম্পদ। তবে একটা প্রশ্ন থেকেই যায় কোন্ সময় থেকে এই লোকগীতগুলির প্রচলন? লোক বিজ্ঞানীরাও তার কোনো সঠিক ব্যাখ্যা দিতে পারেননি। লোকবিজ্ঞানীদের ধারণা আদিম সমাজে নানারকম আচার-উৎসব, পূজা-পার্বণ এবং কর্মের ভিত্তিতে লোকগীতগুলির জন্ম। পরবর্তী যুগে তা প্রসারিত হয়ে জীবনের নানা ক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়ে। মানুষের স্মৃতির দাঁড়াই এই লোকগীতগুলি এক যুগ থেকে আরেক যুগে চলে আসছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের দেশে লোকগীতগুলির সংরক্ষণের কোনো ব্যবস্থা না থাকায় কালক্রমে লোকগীতিগুলি হারিয়ে যাচ্ছে।

বর্তমান রাভা সমাজে লোকগীতের অবস্থান

উত্তরবঙ্গের রাভা বসতি অঞ্চলগুলিতে তাদের লোকগীতগুলি বর্তমানে আর খুঁজে পাওয়া যায় না। কালক্রমে তাদের এই লোকগীতগুলি তাদের সমাজ থেকে হারিয়ে যাচ্ছে। ক্ষেত্রসমীক্ষার মধ্যে দিয়ে তাদের লোকগীতগুলি সংগ্রহ করার চেষ্টা করলেও ব্যর্থ হতে হয়েছে এবং বোঝা যাচ্ছে যে তাদের লোকগীতগুলির প্রাসঙ্গিকতা বর্তমানের রাভা সমাজের মানুষের মধ্যে নেই। এখনকার রাভা তরুণ প্রজন্মের মধ্যে তাদের লোকগীত সম্পর্কে তেমন কোনো ধারণাই নেই। রাভা সমাজের বয়স্ক মানুষদের সাথে কথা বলেও তাদের লোকগীতগুলি উদ্ধার সম্ভব হয়নি। কেননা তাদের মুখ থেকেই জানা যায় ভুলে যাওয়ার কথা।[৩৮] সময়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনহীন বিষয়গুলি সমাজ থেকে হারিয়ে যায় রাভা সমাজের লোকগীত হয়তো তার'ই একটা ছাপ। রাভা লোকগীত বিষয়ক বিভিন্ন প্রকাশিত গ্রন্থের সূত্র ধরেই রাভা জনজাতির হারিয়ে যেতে বসা রাভা লোকগীতগুলি বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছি।

মাছ ধরার গীত

একসময় রাভা বসতি অঞ্চলগুলিতে প্রচুর পরিমাণে চিংড়ি মাছ পাওয়া যেত। রাভা গ্রামগুলি বনাঞ্চলে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে হওয়ায় তাদের বসতি অঞ্চলগুলির পাশ দিয়েই অনেক নদী-নালা বয়ে যেত দেখা যায়। তবে এখনো উত্তরবঙ্গের রাভাবসতি অঞ্চলগুলিতে অনেক নদী-নালা দেখা

গেলেও চিংড়ি মাছ আর পাওয়া যায় না। এরকম হারিয়ে যাওয়া কয়েকটি গীত আলোচনা করা হল।

১

"ফালাকাটার জাকৈ নিয়ে

শিঙিমারির খলুই নিয়ে

মাছ ধরতে চলরে দিদি যাই

ঝর্নার জলে ঝোরার জলে

চিংড়ি মাছ ধরে হাটে বেচব

ভাগাভাগা করে

একভাগ তার বেচে

খাব কিনে মিষ্টি খিলি পান

মাছ ধরাতো সাঙ্গ হল এবার ফিরি ঘরে

বেলা ডুবছে আঁধার হয়ে এল

ঐ যে দেখ বকের সারি

ফিরছে আপন নীড়ে।"[৩৯]

আলিপুরদুয়ার জেলার একটি ব্লক হল ফালাকাটা। তারা ফালাকাটার জাকই এবং শিঙিমারির খলাই নিয়ে মাছ ধরতে যেত। তাদের সমাজে মহিলারাই একসময় বেশি মাছ ধরত তা এই গানের মধ্য দিয়েই প্রকাশিত হয়েছে। তারা মাছ ধরতে যেত সাধারণত ঝর্নার জলে। চিংড়ি মাছ হাটে বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করত তা এই গানের মধ্যে দিয়ে স্পষ্ট ভাবে ফুটে উঠেছে।

দুরূহ শব্দ: জাকৈ (জাকই) বাঁশের তৈরি মাছ ধরার যন্ত্র। শিঙিমারি (কোচবিহার জেলার একটি গ্রাম পঞ্চায়েত অঞ্চল)।

২

জাকৈ নিলাম হাতে

তুমি খালুই হাতে

এসো ওইখানে

যেখানে বুড়া নদী বইছে

চল

ওখানে আমরা

চিংড়ি মাছ ধরি।”[৪০]

চিংড়ি মাছ ধরার একটি গীত। জাকই আর খলাই নিয়ে স্রোতহীন নদীতে মাছ ধরার কথা বলা হয়েছে।

দুরূহ শব্দ: বুড়া নদী (স্রোতহীন নদী)।

৩

“নতুন বছরের নতুন জলে

তরঙ্গমালার ঢেউ-এর তালে তালে

অকূল পাড়বিহীন সাগরের কিনারায়

আমরা মাছ ধরতে যাই

এসোগো সখীরা

কুরুয়া যখন ডাকে,

বকগুলো যখন উড়ে যায়,

আর মাছরাঙা পাখি যখন

মাছের লোভ করে,

আমরাও তেমনি

যেখানে মাছ পাব, সেখানে গিয়ে মাছ ধরি।"[৪১]

এই গানের মধ্যে দিয়ে রাভা সমাজের দলগত ভাবে মাছ ধরার কথা জানতে পারি। মাছ ধরা তাদের একসময় পেশা ছিল। মাছ ধরা যেন তাদের কাছে একটি উৎসব। মাছ ধরাকে তারা আনন্দ হিসাবে নিত। নতুন বছরের শুরুতে যখন জল প্রবেশ করে বিভিন্ন নদী, নালা, পাহাড়ের ঝর্নায় তখন তাদের মধ্যে মাছ ধরার একটা আলাদা উদ্দীপনা দেখা যেত। তারা যেখানেই মাছ পাবে সেখানেই যেতে রাজি। কুরুয়া, বক, মাছরাঙা এই পাখিরা মাছ খেয়ে বেঁচে থাকে, এই পাখিদের মতো রাভা পরিবারের মহিলাদের মাছের প্রতি একটু আলাদা লোভ ছিল।

দুরূহ শব্দ: কুরুয়া (জলজ পাখি বেশীর ভাগ সময়ই জলে ডুবে থাকে)।

পূজা-পার্বণ গীত

রাভা সমাজে একসময় অনেক দেব-দেবীর পূজার প্রচলন ছিল। অঞ্চলভেদে পূজার নামও আলাদা হত। যেমন মায়তারি রাভাদের একটি প্রধান উৎসব ছিল বায়খো পূজা। রংদানি রাভারা ছিছোরা দেবী এবং কোচ রাভারা রুন্তুক বাছেক-দেবীর পূজা করত। আগের দিনের রাভাদের সকলে তামাই, দাদুরি, নাকাটি এই তিন দেবীকে বীরাঙ্গনা বলে মনে করত। একটি নির্দিষ্ট স্থানে প্রতি বছর বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ মাসে এই পূজা করা হত। আগে সাত দিন সাত রাত ধরে এই পূজা হত। কিন্তু পরে এই পূজা তিন দিন, তিন রাত ধরে হতে দেখা যায়। উৎসবের প্রথম দিনে ঘর শুদ্ধিকরণ করা হত এবং সেদিন প্রত্যেক গৃহস্থের ঘরে চালের গুড়ো ছিটিয়ে দেওয়া হত। পূজারি রাই ঘরে ঘরে গিয়ে এই ধরণের গীত গাইত। এই গানের গীতগুলো অনেক লম্বা ছিল। রাস্তার পাশে কাঠের তৈরি মন্ডপ বানিয়ে এই পূজা একসময় প্রচলন ছিল। পূজার শেষে কৃত্রিম যুদ্ধের আয়োজন করা হত। মণ্ডপ ভাঙ্গারও একটি অনুষ্ঠান ছিল। এই পূজায় মণ্ডপ ভাঙ্গার সময়ও একটি নৃত্য গীত করা হত।

(ক) মায়তারি রাভাদের গীত

১

"ফই ফই হাছি ছানি কুৰি ছাওৰাতাংও

কুৰি ছানি চিংবা তোবালাতি,

কুৰি খেৰে ছানা লাগিয়া

চিংবা তোখা গা-ছে পুই খেৰেছে

ছাই ৰেঙা লাগিয়া।”[৪২]

এই গানের মধ্যে দিয়ে ছেলে মেয়েদের পূজার স্থানে আসতে বলা হচ্ছে এবং হাসি ফূর্তি করে কাজ করার কথা বলা হয়েছে। পূজার শেষে তারা আনন্দে খাওয়া-দাওয়া করে। তারা কাকের মত উড়ে খেলে জীবনধারণ করতে চায়। এই গানের মধ্য দিয়ে উঠন্ত ছেলে মেয়েদের কাজ করার একটা ইঙ্গিত পাওয়া যেত।

দুরূহ শব্দ: হাছি ছানি (ছেলে মেয়ে), তোবালাতি (হাসি ফূর্তি)।

২

“ হৈ মাৰু হৈ মাৰু , আ- হা

বি’ছাই দু’মচা মাই বাদি আয়া তামাই,

ছোংদা চোঙা হাদামি দু’মচাই বা আয়া তামাই

বি হাওয়ো মানিমুং আয়া তামাই

হানু হাওয়ো মানিমুং আয়া তামাই

খু’ছানতিনি হাবাংয়ো মানিমুং আয়া তামাই

খু’ছানতিনি মানিমুং আয়া তামাই।”[৪৩]

হে মা তুমি কচি ধানের গাছের নিচে কেন জন্মাও না? আউশ ধানের নিচে কেন জন্ম নেও না? আমন ধানের নিচে কেন তুমি জন্মাও না? দিনের বেলা সূর্যের তাপ যেখানে পড়ে সেখানে কেন তুমি জন্মাও না? রাতে চন্দ্রের আলো যেখানে পড়ে সেখানে তুমি কেন জন্ম নেও না? হে মা তামাই তুমি যে মাটিতে সার আছে সেই মাটিতে জন্ম নেও। তামাই দেবী বলতে কৃষিদেবী মা লক্ষ্মীকে বোঝানো হয়েছে আলোচ্য গীতে।

দুরূহ শব্দ: মাৰু (মা), বি'ছাই (কচি ধানের গাছ), তামাই (মা লক্ষ্মী)।

৩

"অৰেহং অৰেহং আয়া

নামা নাইচং চায়াচং আয়া অৰেহং

হেৰ জামা ছাৰিয়া আয়া

নামা নাইচং চায়াচং আয়া অৰেহং।"[৪৪]

বায়খো পূজার মন্ডপ ভাঙ্গার গীত। এই গানে বলা হয়েছে, হে মা আমরা বাহুবল, আমরা বিশ্ববিজয়ী বীর। আমাদের বিশ্বজয়ী শক্তি দাও, যেন বিশ্বজয় করতে পারি।

(খ) রংদানি রাভাদের গীত

রংদানি রাভা সকলের মতে তাদের প্রধান বীরাঙ্গনা মা ছিছোরা দেবী। রংদানি রাভাদের বায়খো পূজার মূল অধিষ্ঠাত্রী দেবী মা ছিছোরা

১

"হোয়ও আয়া ছিছোৰা,

আয়া ছিছোৰাণী পৰানো ই'নাদে

আয়া ছিছোৰা

"আয়া ছিছোৰাণী কান কানিয়া দঙা

তেমাছে হোয়ও আয়া ছিছোৰা।"[৪৫]

হে মা ছিছোরা দেবী তুমি আমার আন্তরিক ভক্তিতে সন্তুষ্ট হও। হে মা ছিছোরা আমার ভক্তি পুষ্পাঞ্জলী গ্রহণ কর।

দুরূহ শব্দ: ছিছোৰা (রংদানি রাভাদের একটি দেবীর নাম), ছিছোৰাণী (পুষ্পাঞ্জলী)।

২

“আয়া ছিছোৰা, তনছা বা দঙা তেমাছে,

হোয়ও আয়া ছিছোৰা

“অচিমে মাৰুক্ষেত্রী জোৰা ই’নাদে,

হোয়ও আয়া ছিছোৰা

অচিমে গেবোক পার্ছ্য

খেখ্না লাগিয়া ই’না দে,

হোয়ও আয়া ছিছোৰা।”[৪৬]

মা ছিছোরা ধন সম্পদে আমাকে ঐশ্বর্যশালী কর। আমরা বীর মারুক্ষেত্রীর বংশধর। বীরের দেশেই আমার জন্ম। আমরা সকলে মিলে তোমার চরণে ভক্তি অর্পণ করি।

দুরূহ শব্দ: তনছা (ধন)।

৩

“আগাৰাণী ছানা দে – এ আয়া

বক্ষানী ছানা দে – এ আয়া

নাঙি পূর্বানি আচাৰবানি বিচাৰবানি ৰায়

চিঙি পালি প্রহৰিতাং, নাঙি চালাম চিঙি ৰায়।”[৪৭]

এই গীতটি রংদানি রাভাদের অগ্নি পূজার গীত। এই গানে বলেছে হে মা অগ্নিদেবী আমরা প্রাচীন আচার নীতি মেনে চলি।পবিত্র ঘিলা (এক ধরনের ফল) মেশানো পরিষ্কার জলে স্নান করে এসেছি। আমরা সবাই তোমাকে দেবী জ্ঞানে ভক্তি বিশ্বাসের প্রণাম করি এবং অঞ্জলি জানাচ্ছি।

দুরূহ শব্দ: আগাৰাণী (পুরাণে অগ্নি হল পুরুষ দেবতা কিন্তু তারা দেবী রুপে পূজা করে, আগাৰাণী বলতে অগ্নিদেবীকে বোঝানো হয়েছে), পূর্বানি (প্রাচীন)

(গ) কোচ রাভাদের গীত

কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার এবং আসামের গোয়ালপাড়া জেলায় কোচ রাভারা বাস করে। এই জেলাগুলির কোচ রাভারা সকলেই গৃহদেবী হিসেবে রুন্তুক বাছেক-দেবীর পূজা করত। এই পূজা করা হত ভূত, পেত, অসুখ-বিসুখ, আপদ-বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য। এই পূজার মূল উদ্দেশ্য ছিল ধন কামনা করা। তাদের ধারণা ছিল যে রুন্তুক-বাছেক এরা দুই বোন। রুন্তুক হল দিদি আর বাছেক হল বোন।

১

"হল জল জিনু'উ

হল জল জিনু'উ

সোনা নাগু নাবু'উ

হাতীবাই তাছাই

ঘোঁৰা বুউ তাছাই

হল জল জিনু'উ

হল জল জিনু'উ।"[৪৮]

হে মা রুন্তুক-বাছেক। তোমরা দুই বোন। হে রুন্তুক মা তোমার জন্য সোনার ঘরের ব্যবস্থা করেছি। হে বাছেক মা তোমার জন্য রূপোর ঘরের ব্যবস্থা করেছি। আমাদের প্রতি কি কৃপা নেই? হাতির পিঠে উঠে তুমি চলে যেওনা। ঘোড়ার পিঠে উঠে তুমি চলে যেওনা। হে মা রুন্তুক, হে মা বাছেক আমার প্রতি কৃপা রেখো।

দুরূহ শব্দ: জল জিনু (দুই বোন) সোনা নাগু (সোনার ঘর)।

২

"অহ ! খু'ছামি বাই জাদি

হানাছা বিছাই তইমেন?

কাৰাহা তইমেন?

কামাছা তইমেন?

খু'ছানতিনি হাদামি তইমেন?

খু'ছানতিনি হাদামি তইমেন?

মেৰামতি ৰাইমেন খু'ম্পাৰমতি ৰাইমেন

ৰাইচিদুৰি ৰাইমেন

ৰাবাদুৰি বাইমেন

বলিবো তুনুকা-বাদাবো তুনুকা।"[৪৯]

অসুখ-বিসুখের সময় এই গীত গাওয়া হত। সন্ধ্যার সময় যদি রাভা পরিবারের কারো জ্বর হত তা হলে উঠোনে পূজারি এই গীত গাইত। এই গানে বলা হয়েছে, হে সন্ধ্যার দেবতা তুমি কোথায় আছো? ঠাণ্ডাতে আছো নাকি? কোনো উঁচু জায়গায় আছো নাকি? কোন নিচু জায়গায় আছো নাকি? যেখানেই তুমি থাকো আমরা পবিত্র চালের গুড়ো দিয়ে তোমার পূজা করছি।

দুরূহ শব্দ: খু'ছামি বাই (সন্ধ্যার দেবতা)।

কর্মগীতি

রাভা সমাজের মানুষেরা কৃষিজীবী। শস্য খেতের উপর নির্ভর করেই তাদের সংসার চলে। ধান জন্য তারা বিশেষ কামনা করে পূজা দিত। ধান যেন বেশি ফলে, ধানে যেন পোকা না ধরে। ফসলের যেন কোনো ক্ষতি না হয়। জমিতে কাজ করার সময় তারা বিভিন্ন দেব-দেবীর গীত গাইত। তেমনি তারা মদ তৈরি করার সময়ও বিভিন্ন গীত গেয়ে থাকত। এমনকি গাছ কাটার সময়ও তাদের মুখ থেকে বিভিন্ন দেব-দেবীর গীত শোনা যেত। এরকম কয়েকটি গীত আলোচনা করা হল -

১

“ইয়ান চিঙি চার্পাক, ইয়ান চিঙি চার্পাক,

পাথাৰিনি মায় নাৰি, ইযান চিঙি চার্পাক,

পাটা হায়নি পাটা নাৰি, ইযান চিঙি চার্পাক,

হিৰি হিৰি খিছিন ৰাম্পার

চাক তমোতে ৰেঙা,

চিকুৰ চিকুৰ নুকে কাকায

চিঙি খাপাক খিছিনা মাও

চিঙি খাপাক খিছিনা।”[৫০]

পাতা ভর্তি কোমল ধানের গাছকে প্রাণ বলেছে তারা। তেমনি আবার পাতা ভর্তি পাকা ধানের গাছকেও প্রাণ বলা হয়েছে আলোচ্য গীতে। আমরা কৃষকের সন্তান পাতার মধ্যেই বেঁচে থাকব। নতুন ধানের পাতা যখন হয় তখন আমাদের মন ভরে যায়।

দুরূহ শব্দ: পাথাৰিনি (পাতা ভর্তি)।

২

হাংগাৰ জোৰছা ৰাখুইতা

মেমাং গি’জাৰ না,

ব্রেক গছা আলাইতা

মিছি গি’ জাৰ না;

আঙি চকো তান্কায় আনা

মেমাং মিছি চাপা।”[৫১]

কলসির ভিতরে একটি আগুনে পোড়ানো কাঠের টুকরো রাখা আছে। ভূত পেত যাতে চকোৎ (মদ) নষ্ট করতে না পারে তার জন্য লাউ এর টুকরো রাখা আছে কলসির ভিতরে।

দুরূহ শব্দ: আলাইতা (টুকরো), হাংগাৰ (আগুনে পোড়ানো কাঠ)।

৩

"গি'মাৰছিনি থে অ

আং চকো তানা,

কায় পাগ্লা চাঙে ৰুংদং

দঙা লাগিয়া।"[৫২]

মদের কলসি ঠিক জায়গায় রাখার জন্য এই গানটি গায়। এই গানে বলা হয়েছে, আমি একে সযত্নে রেখেছি। যাতে সবসময় উৎকৃষ্ট থাকে। নেশা করার সময় যাতে কেউ মাতাল না হয়।

দুরূহ শব্দ: চকো (মদ)।

৪

"বাৰ কামলাৰ ভৰ ওই

তেৰ যুবানৰ বল-হেইয়া।

মহামাই নাম ধৰিযা

গাছ কাটং আমি- এ হেইয়া।

মহামাই দিলে বৰ

গাছ টানং ঝৰাঝৰ- এ হেইয়া।

আমালাগা গাছখানি নদীতে যাযইযা পৰ- এ হেইযা।"[৫৩]

এই গানটি গাছ কাটার সময় গাওয়া হত। এই গানে যুবকের দল মহামাই দেবতার কাছে বর চাইছে তারা যেন সর্বশক্তি দিয়ে গাছ কাটতে পারে এবং তাদের যেন কোনো রকম ক্লান্তি না আসে। মহামাই দেবতার যদি বর দেয় তাহলে তারা দ্রুততার সহিত গাছ কাটতে পারবে।

দুরূহ শব্দ: মহামাই (দেবতা)।

শ্রাদ্ধের গীত

রাভা সমাজের মানুষেরা শ্রাদ্ধের সময় নানা রকম গীত গাইত। এই বিষয়ে কয়েকটি গীত আলোচনা করা হল।

১

"ফেনছা নাং নেম্কায় ৰাভানি নুকি জনম ৰাখু।

পানফাং- ছান জনম তাৰিখু, ফাৰিখু, ফাৰি বাৰ ছয় ছানো।

তো হাংছিং জনম কায়তাং থতকায় ছানো

মাছু মিছি জনম তাৰাখু, কায়তাং হাল বায়নো

চোং কাংকু জনম তাৰিখু, তো ৰিজান ছানো"।[৫৪]

রাভা পরিবারের কেউ মারা গেলে শ্রাদ্ধের সময় এই গীত গাওয়া হয়। এই গানে বলা হয়েছে তুমি বড় ঘরে জন্মগ্রহণ করবে। গাছ হয়ে জন্ম নেবে না, যদি নেও তাহলে মানুষ তোমাকে পুড়িয়ে ফেলবে। শূকর হয়ে জন্ম নিলে তোমার মেরে খেয়ে নেবে। গরু হয়ে জন্ম নিলে তোমায় জমিচাষ করতে হবে। পোকামাকড় হয়ে জন্ম নিও না তাহলে মুরগিরা তোমাকে খেয়ে নেবে।

দুরূহ শব্দ: ৰিজান ছানো (মুরগির বাচ্চা), চোং কাংকু (পোকামাকড়)।

২

"লেমমতে লমাইমু'ন লায়িতানা না না,

চংমতে চঙাই তানা

নুংনি হতং তেনে মু'না দাঙা না দাঙাইচাং।"[৫৫]

এই গীতটি কোচ রাভাদের শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানের গান। এই গানে বলা হয়েছে, তুমি যখন বেঁচে ছিলে তখন তোমাকে চকোৎ খাইয়েছি। এখন তোমার মুখে রুচি আছে কি না জানি না তাও তুমি খাও।

দুরূহ শব্দ: লেমমতে (যখন), লমাইমু (বেঁচে থাকা)।

প্রেমের গীত

রাভা সমাজের যুবক-যুবতির মুখে একসময় নানা রকমের প্রেমের গীত শোনা যেত। এ বিষয়ে কয়েকটি গীত আলোচনা করা হল -

১

আলি আলি বেৰালি আলি চিনাজোক

চিনেনা নাচিনে ছালে

বাতাপাৰা লোক (হবছৈ, হবছৈ,)

ছাৰা হাচু ঘুৰাইবা, দয় ফাঙা ভংচা,

আতা বায়খো, ছায়বা ছালে,

মুকবাৰকায়ো ভংচাৰে মুকবাৰকায়ো ভংচা।"[৫৬]

রাস্তা দিয়ে হাটার সময় যখন চিনাজোক দেখা যায়। হে বন্ধু তুমি চিনতে পারো কি পারো না? আমি বাতাপাড়ার একটি মেয়ে। আমি পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেরিয়ে একটাও অমরা টেঙার গাছ দেখতে পেলাম না। বায়খো পূজাতে যে বন্ধু পছন্দ হয়েছিল তাকেও দেখতে পেলাম না।

দুরূহ শব্দ: আলি (জমির আল), বাতাপাৰা (জায়গার নাম)।

২

"মায় ববং বাকায়বে, চাক ৰৰেং ৰৰেংৰে

চাক ৰৰেং ৰৰেং

চিঙি মুকবাৰবাকায় বে ছালে। নুখাং ৰৰেং ৰৰেং। (হবছৈ, হবছৈ)।"[৫৭]

ধান জন্ম হওয়ার আগে পাতাগুলো দেখতে খুব সুন্দর। আমি যাকে পছন্দ করেছিলাম সেও ভীষণ সুন্দর।

উপসংহার

রাভা লোকগীতগুলির মধ্যে দিয়েই উঠে আসে তাদের জনজীবনের অতীত এবং বর্তমান। তাই একথা বলাই যায় রাভা জনজাতিকে চিনতে গেলে তাদের লোকগীতগুলি আমাদের গভীরভাবে বিশ্লেষণ করা উচিত। আসাম ও উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ অঞ্চলগুলিতে বসবাসকারী রাভা জনজাতির লোকগীতগুলি একসময় একই ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে সময়ে তাদের সামাজিক, ধর্মীয় এবং নানারকম রীতি-নীতির প্রভাবে উপগোষ্ঠী অনুযায়ী লোকসঙ্গীতগুলি আলাদা হয়ে যায় এবং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে হারিয়ে যেতে থাকে। প্রকৃতি-বৈচিত্র্য, জাতিগত বা সম্প্রদায়গত কারণে কোনো কোনো অঞ্চলে একটি বিশেষ ধারার লোকগীত প্রসার লাভ করে। উত্তরবঙ্গের রাভা বসতি অঞ্চলগুলিতে যে লোকগীতের প্রচলন ছিল সেগুলিকে আমরা আঞ্চলিক গীত হিসাবে ধরতে পারি। উত্তরবঙ্গের রাভা সম্প্রদায়ের মানুষদের মুখে একসময় নানারকম লোকগীত শোনা যেত এবং তাদের লোকগীতের মধ্যে দিয়ে নিত্যদিনের সুখ-দুঃখ, হাসি-বেদনা, কর্মজীবনের ইঙ্গিত পাওয়া যেত। একটা জাতিকে চেনার জন্য লোকগীতি গুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যেক জনজাতির আলাদা সংস্কৃতি এবং আলাদা বৈশিষ্ট্য রয়েছে। রাভা জনজাতিও আলাদা সংস্কৃতি এবং বৈশিষ্ট্য নিয়ে বিরাজমান। কোনো জনজাতিকে চিনতে গেলে তাদের লোকগীতগুলির যে কতটা গুরুত্ব রয়েছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। রাভা জনজাতির লোকগীতগুলি যদি আমরা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করি তাহলে দেখতে পাব তাদের লোকগীতগুলির মধ্যে দিয়ে তাদের গোটা সমাজ ব্যবস্থার চিত্র ফুটে উঠেছে। লোকগীতগুলির মধ্যে দিয়েই আমরা একটা জাতির অতীত জীবনের ইতিহাসের সঙ্গে বর্তমান জীবনের কোথায় সাদৃশ্য এবং কোথায় বৈসাদৃশ্য রয়েছে তা জানতে পারি। এই সব দিক বিচারে করে রাভা লোকগীতির গুরুত্বকে আমরা অস্বীকার করতে পারি না।

৩.১১ ডাইনি তন্ত্র-মন্ত্র ও লোকচিকিৎসা

উত্তরবঙ্গের আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে মন্ত্র-তন্ত্রের উপর ছিল অগাধ বিশ্বাস। আলিপুরদুয়ার জেলার রাভা জনজাতিও এর ব্যতিক্রম নয়। তাদের মনে বিশ্বাস ছিল যে ডাইনিরা মানুষের রক্ত শোষণ করে, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ডেকে আনে, রোগ ছড়ায়, গাছের ফসল নষ্ট করে, মানুষের উপর ভর করে, মন্ত্র বলে জানোয়ারের রূপ ধারণ করে। ডাইনি সম্পর্কেও এরকম বিশ্বাস তাদের মনে ছিল। এই বিশ্বাসের মূলে ছিল পুরোহিত তন্ত্র। অপদেবতা ভূত-পেত্নী ডাইনি সবই অসহায় মানুষের কল্পনার ফসল ওঝাদের মন্ত্রশক্তির উপর অসীম আস্থা ও বিশ্বাস একসময় তাদের মনে ছিল। যদি তাদের অসুখ হত কিংবা কোনো জিনিস চুরি গেছে তাহলে তারা ওঝা ডাকত। ওঝা এসে পূজা ও মন্ত্র-তন্ত্রের সাহায্যে রোগ সারিয়ে দিত। চুরি হওয়া জিনিস কে চুরি করেছে বলে দিতে পারত ওঝা।

ওঝা যদি কাকতালীয় ভাবে কাজটি সম্পন্ন করতে পারত তার পাওনা হত মোটা টাকার দক্ষিণা, উপঢৌকন। সাপের বিষ নামানো, ভূত বন্ধন মন্ত্র, সাপ কাটার পর পায়ে বাঁধন দেবার মন্ত্রের উপর রাভা সমাজে বিশ্বাস ছিল। আসলে তাদের অজ্ঞতা এবং কুসংস্কারের সুযোগ নিয়ে একশ্রেণির মানুষ অর্থ উপার্জনে লিপ্ত ছিল।

মতলববাজ লোকেরা প্রতিবেশীদের জব্দ করার জন্য তাদের সম্পত্তি হাতানোর জন্য বা অন্য কোনো অসৎ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য ওঝাকে ঘুষ দিয়ে কাজে লাগাত। আসলে ডাইনির অস্তিত্ব বলে কিছু ছিল না। ডাইনি বিশ্বাস লালন-পালনের মুলে ছিল পুরোহিত তন্ত্র। আদিম যুগের মানুষ অশুভ প্রাকৃতিক ঘটনার ব্যাখ্যা করতে না পেরে অতিপ্রাকৃত শক্তির আশ্রয় নিয়েছিল। অপদেবতা ভূত-পেত্নী, ডাইনি সবসময় অসহায় মানুষের কল্পনার ফসল। অপশক্তি থেকে আত্মরক্ষার তাড়নায় যাদুবিদ্যা, তুকতাক, তান্ত্রিক অভিচার ক্রিয়াকে আঁকড়ে ধরেছে ছিল। অসহায় জনিত সংস্কার, বিশ্বাসকে মূলধন করে একশ্রেণির লোকেরা পুরোহিততন্ত্র কায়েম করেছে। কিন্তু বর্তমানে তাদের চিন্তা ভাবনা অনেক পরিণত হওয়ায় তাদের মন থেকে ডাইনি মন্ত্র-তন্ত্রের অবসান ঘটছে।[৫৮]

একসময় তাদের সমাজের মানুষেরা যখন পাহাড়ে জঙ্গলে বাস করত, তখন কিছু মানুষ অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে লতাপাতা, গাছের ছাল, মূল প্রভৃতি চিবিয়ে খেয়ে রোগমুক্ত হতে চেষ্টা করত। তাছাড়া, তুকতাক্, মাদুলি, কবচ, যাদুবিদ্যা প্রভৃতি রোগের প্রতিষেধক হিসাবে

ব্যবহার করা হত। আবার একসময় মন্ত্র উচ্চারণ, পূজা-পার্বণ প্রভৃতির মাধ্যমেও রোগ নিরাময় হতে দেখা যেত রাভা গ্রামগুলিতে। কিন্তু বর্তমানে রাভা সমাজ কুসংস্কারকে দূরে সরে দিয়ে বিজ্ঞান নির্ভর হতে পেরেছে। মানুষের উপর দেবতার ভর হবার বিষয়টি ছিল পুরোপুরি বুজরুকি। ওঝাদের বিষমোচন এবং জড়িবুটি ও গাছ গাছড়ার ওষুধ রোগীদের অনেক সময় সুস্থ করে তুলত। অনেক সময় মনস্তাত্ত্বিক কারণে ওঝার প্রতি বিশ্বাসবশতও রোগী ভালো হয়ে যেত এর সাথে মন্ত্র-তন্ত্রের কোনো সম্পর্ক ছিল না।

একসময় দেখা যেত যে আলিপুরদুয়ার জেলার রাভা জনজাতির মানুষ লোকচিকিৎসার উপর নির্ভর করত। কিন্তু বর্তমান আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থায় পুরাতন লোক চিকিৎসার অবলুপ্তি ঘটেছে। রাভা সমাজে বিশেষত গ্রামীণ এলাকাগুলিতে রোগ-ব্যাধি দূর করার জন্য একমাত্র অবলম্বন ছিল লোকচিকিৎসার। তারা একসময় রোগ-ব্যাধির হাত থেকে নিরাময়ের জন্য লোকবিশ্বাস অনুযায়ী তন্ত্র-মন্ত্র, দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ছিল। তাদের সমাজে কেউ জটিল রোগে আক্রান্ত হলে তাদের লোকবিশ্বাস অনুযায়ী মনে করা হত কোনো অপদেবতা ভর করেছে। অপদেবতাকে দূর করার জন্য তারা তন্ত্রের সাহায্য নিত এবং অপদেবতার উদ্দেশ্যে পশু বলি দেওয়ার প্রচলন ছিল। তাদের বিশ্বাস যে পশু বলি দিলেই যে দেবতা ভর করেছে সে দেবতা রোগীর শরীর থেকে দূর হয়ে যাবে এবং রোগী সুস্থ হয়ে উঠবে।

এছাড়াও তাদের শারীরিক যে কোনো সমস্যার জন্য তারা নিজেরাই ওষুধ তৈরি করত। সেসব ওষুধের উপাদান ছিল গৃহপালিত ও বন্যপ্রাণীর দেহের বিশেষ অংশ। তেল, মাখন, চর্বি, গাছের শিকড়, গাছের ডাল, গাছের পাতা, উপাদান হিসাবে ব্যবহার করত। তারা যথাযথ বিজ্ঞানসম্মত তথ্য অনুসন্ধান ও গবেষণার মাধ্যমে এসব লোক ওষুধের গুণাগুণ নির্ণয় করতে পারত। রোগ প্রতিরোধে তাদের তৈরি লোকওষুধ অত্যন্ত কার্যকর ইতিবাচক ভূমিকা পালন করত। ওঝার তৈরি ওষুধ, তাগা, তাবিজ, মাদুলি, দেহস্পর্শ, ইত্যাদির প্রতি ছিল তাদের বিশ্বাস। জলকষা, তেলপড়া, ঝাড়ফুঁকের দ্বারাও অনেক জটিল রোগ নিরাময় হত বলে তারা মনে করত। আর এভাবেই একশ্রেণির মানুষ পয়সা কামাত। এক-দুই জন মানুষ এই সব তুকতাকে আরোগ্য লাভ করলে কবিরাজ গ্রামে গ্রামে প্রচার করত। এভাবে ওঝা বা কবিরাজের একবার নাম হয়ে গেলে তিনি দু-হাত দিয়ে টাকা কামাত। অর্থাৎ সাধারণ মানুষের অন্ধ বিশ্বাসকে কাজে লাগিয়ে একশ্রেণির মানুষ রমরমিয়ে ব্যবসা করত। ওঝাদের মধ্যে অবশ্য কেউ কেউ হাতুড়ি চিকিৎসা জানতেন

তাতে অনেক সময় কাজ হত অনেক সময় রোগীর মৃত্যু ঘটত। আর রোগ জটিল হলে বা রোগীর মৃত্য হলে ওঝা সমস্ত দায় ডাইনির উপর চাপিয়ে দিত।

আধুনিক সভ্য সমাজের আলো থেকে বঞ্চিত অনেক দূরে, বনে-জঙ্গলে, পাহাড়-পর্বতে, গ্রাম-গ্রামান্তরে বসবাসকারী রাভা জনজাতি তা বিশ্বাস করে এসেছিল। এমন কি তারা মনে করত যে, জ্বর-সর্দি-কাশি এসব উপসর্গ দেখা দিলে 'মিচিক রায়' এর মানত করলেই অসুখ-বিসুখের উপশম হয়। এই পুজায় ফল মূল, ধুপ-দীপ, চাল-কলা, ইত্যাদির সঙ্গে একটি লাল মোরগ বা মুরগি উৎসর্গ করা হত। রাভা ভাষায় মন্ত্রতন্ত্র জানেন এমন ব্যক্তিদের বলা হয় 'হুজি'। তারাই অন্যান্য দেব-দেবীর মতো 'মিচিক রায়ের' পূজা করত।[৫৯] পূজার শেষে প্রসাদ বিতরন করা হত। রোগগ্রস্ত বালক বা বালিকাকে প্রথমে প্রসাদ দেওয়ার নিয়ম ছিল। সেই প্রসাদকে তারা ওষুধ বলে মনে করত। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে বিজ্ঞানের উন্নতি ও প্রসারের ফলে মানুষ রোগ সম্পর্কে সচেতন হয়েছে। যাদুবিদ্যা এবং লোকচিকিৎসার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে সময়ের সঙ্গে।

উপসংহার

আলিপুরদুয়ার জেলার রাভা সমাজের মানুষেরা বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে বিভিন্ন সময়ে নানা রকমের পূজা-পার্বণ ও আচার-অনুষ্ঠান, রীতি-নীতি পালন করেছিল। সে বিশ্বাস কোথাও রোগ-যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য, কোথাও কৃষি ও সমাজ সংসারের মঙ্গল কামনার জন্য। আর এই পূজা-পার্বণের সঙ্গে জড়িয়ে ছিল তাদের অন্তরের আবেগ ও আন্তরিকতা। আর এই পূজা-পার্বণ হয়ে উঠত তাদের উৎসব। লৌকিক এইসব পূজা-পার্বণ গ্রামের কোনো প্রকাশ্য স্থানে, প্রাচীন গাছের নিচে, বাড়ির আঙ্গিনায়, গোয়াল ঘরে হয়ে থাকত। অনেক আগে থেকেই এইসকল নানান বিচিত্র পূজা-পার্বণ চলে আসছে রাভা সমাজের মানুষের প্রবহমান বিশ্বাসের ওপর নির্ভর করেই। প্রত্যেক জেলা ও অঞ্চলের নিজস্ব সংস্কৃতি থাকে। বাইরে থেকে তার আদল বোঝা মুশকিল। আলিপুরদুয়ার জেলার লুপ্তপ্রায় রাভা সংস্কৃতির উপর ক্ষেত্রসমীক্ষা করতে গিয়ে যে তথ্য পেয়েছি তা আলোচ্য অধ্যায়ে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছি।

সময়ের আধুনিকতায় পুরাতন নিয়ম-রীতি, আচার-অনুষ্ঠান, লোকসংস্কার-লোকবিশ্বাস মানুষের মন থেকে অনেকটাই মুছে গেছে। এই অধ্যায়ে দেখিয়েছি যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে আধুনিক সমাজ জীবনের কাছে গুরুত্বহীন বিষয়গুলি কিভাবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে হারিয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ

একসময় রাভা সমাজে যে নিয়মরীতিগুলি মেনে চলত সময়ের সাথে তা কিভাবে হারিয়ে যাচ্ছে। একসময় রাভাদের তৈরি কারুশিল্প পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষের মধ্যে উন্নত স্তরে পৌঁছেছিল। কিন্তু সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক প্রয়োজনে শিল্পের চাহিদারও পরিবর্তন ঘটে, ফলে সময়ের সাথে তাদের তৈরি কারুশিল্পও লুপ্ত হওয়ার পথে। তেমনি জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ, শিশুর নামকরণের রীতি-নীতি গুলিও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে হারিয়ে যাচ্ছে। আমরা জানি সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে মানুষও সামঞ্জস্য রেখে চলার চেষ্টা করে। রাভা সমাজও এর ব্যতিক্রম নয়। তাই যে কোনো জাতি বা জনজাতির প্রয়োজনহীন সংস্কৃতিগুলি সময়ের সঙ্গে ক্রমশই হারিয়ে যাবে এটাই তো স্বাভাবিক এবং সময়ই তার দলিল।

তথ্যসূত্র

১. কান্দুরি রাভা (মহিলা, বয়স: ৫২, পেশা: গৃহবধূ, গ্রাম: বড়বস্তি, গ্রাম পঞ্চায়েত অঞ্চল: শালকুমার ২, জেলা: আলিপুরদুয়ার, সংগ্রহের কাল: ১৮-০২-২০১৮)।

২. তদেব।

৩. সমারি রাভা (মহিলা, বয়স: ৫৩, পেশা: গৃহবধূ, গ্রাম: ছোটবস্তি, গ্রাম পঞ্চায়েত অঞ্চল: শালকুমার ২, জেলা: আলিপুরদুয়ার, সংগ্রহের কাল: ০৬-০২-২০১৮)।

৪. তদেব।

৫. বিনতা রাভা (মহিলা, বয়স: ৩৪, পেশা: গৃহবধূ, গ্রাম: বড়বস্তি, গ্রাম পঞ্চায়েত অঞ্চল: শালকুমার ২, জেলা: আলিপুরদুয়ার, সংগ্রহের কাল: ১৮-০২-২০১৮)।

৬. তদেব।

৭. তদেব।

৮. লতিকা রাভা (মহিলা, বয়স: ৫৫, পেশা: গৃহবধূ, গ্রাম: বড়বস্তি, গ্রাম পঞ্চায়েত অঞ্চল: শালকুমার ২, জেলা: আলিপুরদুয়ার, সংগ্রহের কাল: ১৮-০২-২০১৮)।

৯. সাবিত্রী রাভা (মহিলা, বয়স: ৩২, আশা কর্মী, গ্রাম: মুন্সী পাড়া, গ্রাম পঞ্চায়েত অঞ্চল: শালকুমার ১, জেলা: আলিপুরদুয়ার, সংগ্রহের কাল: ০৫-০৮-২০১৮)।

১০. ললিতা রাভা (মহিলা, বয়স: ৪৮, গৃহবধূ, গ্রাম: মুন্সী পাড়া, গ্রাম পঞ্চায়েত অঞ্চল: শালকুমার ১, জেলা: আলিপুরদুয়ার, সংগ্রহের কাল: ০৫-০৮-২০১৮)।

১১. ফাগুনেশ্বরী রাভা (মহিলা, বয়স: ৭৯, প্রবীণ মহিলা, গ্রাম: সুরিপাড়া, গ্রাম পঞ্চায়েত অঞ্চল: শালকুমার ২, জেলা: আলিপুরদুয়ার, সংগ্রহের কাল: ১৯-০৮-২০১৮)।

১২. তদেব।

১৩. রসবালা রাভা (মহিলা, বয়স: ৫২, পেশা: গৃহবধূ, গ্রাম: সুরিপাড়া, গ্রাম পঞ্চায়েত অঞ্চল: শালকুমার ২, জেলা: আলিপুরদুয়ার, সংগ্রহের কাল: ১৯-০৮-২০১৮)।

১৪. পুরনী রাভা (মহিলা, বয়স ৫২, পেশা: গৃহবধূ, গ্রাম: সুরিপাড়া, গ্রাম পঞ্চায়েত অঞ্চল: শালকুমার ২, জেলা: আলিপুরদুয়ার, সংগ্রহের কাল: ২০-০৮-২০১৮)।

১৫. সুহিনী রাভা (মহিলা, বয়স ৫৬, পেশা: গৃহবধূ, গ্রাম: সুরিপাড়া, গ্রাম পঞ্চায়েত অঞ্চল: শালকুমার ২, জেলা: আলিপুরদুয়ার, সংগ্রহের কাল: ২০-০৮-২০১৮)।

১৬. বিষ্ণু রাভা (পুরুষ, বয়স: ৫২, পেশা: কারুশিল্প, গ্রাম: ছোটবস্তি, গ্রাম পঞ্চায়েত অঞ্চল: শালকুমার ২, জেলা: আলিপুরদুয়ার)। ০৪-০২-২০১৮

১৭. তদেব।

১৮. ভবেশ রাভা (পুরুষ, বয়স: ৫১, পেশা: দিন-মজুরি, গ্রাম: সুরিপাড়া, গ্রাম পঞ্চায়েত অঞ্চল: শালকুমার ২, জেলা: আলিপুরদুয়ার, সংগ্রহের কাল: ২১-০৮-২০১৮)।

১৯. তদেব।

২০. তদেব।

২১. কর্নেশ্বরী রাভা (মহিলা, বয়স: ৬০, পেশা: গৃহবধূ, গ্রাম: সুরিপাড়া, গ্রাম পঞ্চায়েত অঞ্চল: শালকুমার ২, জেলা: আলিপুরদুয়ার, সংগ্রহের কাল: ২১-০৮-২০১৮)।

২২. আমারি রাভা (মহিলা, বয়স: ৬৪, প্রবীণ মহিলা, গ্রাম: সুরিপাড়া, গ্রাম পঞ্চায়েত অঞ্চল: শালকুমার ২, জেলা: আলিপুরদুয়ার, সংগ্রহের কাল: ২১-০৮-২০১৮)।

২৩. তদেব।

২৪. তদেব।

২৫. তাপসী রাভা (মহিলা, বয়স: ৫৪, পেশা: গৃহবধূ, গ্রাম: সুরিপাড়া, গ্রাম পঞ্চায়েত অঞ্চল: শালকুমার ২, জেলা: আলিপুরদুয়ার, সংগ্রহের কাল: ২১-০৮-২০১৮)।

২৬. তদেব।

২৭. তদেব।

২৮. মল্লিকা রাভা (মহিলা, বয়স: ৫০, পেশা: গৃহবধূ, গ্রাম: সুরিপাড়া, গ্রাম পঞ্চায়েত অঞ্চল: শালকুমার ২, জেলা: আলিপুরদুয়ার, সংগ্রহের কাল: ২২-০৮-২০১৮)।

২৯. তদেব।

৩০. তদেব।

৩১. অনুরাধা রাভা (মহিলা, বয়স: ৫২, পেশা: গৃহবধূ, গ্রাম: সুরিপাড়া, গ্রাম পঞ্চায়েত অঞ্চল: শালকুমার ২, জেলা: আলিপুরদুয়ার, সংগ্রহের কাল: ২২-০৮-২০১৮)।

৩২. তদেব।

৩৩. তদেব।

৩৪. বুধুনি রাভা (মহিলা, বয়স: ৫৬, পেশা: গৃহবধূ, গ্রাম: সুরিপাড়া, গ্রাম পঞ্চায়েত অঞ্চল: শালকুমার ২, জেলা: আলিপুরদুয়ার, সংগ্রহের কাল: ২২-০৮-২০১৮)।

৩৫. তদেব।

৩৬.তদেব।

৩৭. সিদ্দিকী, আশ্‌রাফ (১৯৬৩) *লোক-সাহিত্য* । দ্বিতীয় খণ্ড। ঢাকা: গতিধারা। পৃ. ৮৬।

৩৮. ফাগুনেশ্বরী রাভা (মহিলা, বয়স: ৭৯, প্রবীণ মহিলা , গ্রাম: সুরিপাড়া, গ্রাম পঞ্চায়েত অঞ্চল: শালকুমার ২, জেলা: আলিপুরদুয়ার, সংগ্রহের কাল: ২২-০৮-২০১৮)।

৩৯. রায় দত্ত, বেণু (সম্পাদিত) (২০০২)। *উত্তর বাংলার লোকসংগীত*। কলকাতা: সাহিত্য অকাদেমি। পৃ. ১৯।

৪০.তদেব। পৃ. ২৩।

৪১. তদেব। পৃ. ২০।

৪২. রাভা, রাজেন (১৯৭৪)। *রাভা জনজাতি*। গুয়াহাটি: বীণা লাইব্রেরি। পৃ. ১৩০।

৪৩. তদেব। পৃ. ১৩০।

৪৪. তদেব। পৃ. ১৩১।

৪৫. তদেব। পৃ. ১৩১।

৪৬. তদেব। পৃ. ১৩১।

৪৭. তদেব। পৃ. ১৩২।

৪৮ তদেব। পৃ. ১৩২।

৪৯. তদেব। পৃ. ১৩৩।

৫০. তদেব। পৃ. ১৪৮।

৫১. তদেব। পৃ. ১৪৮।

৫২. তদেব। পৃ. ১৪৯।

৫৩. তদেব। পৃ. ১৫০।

৫৪. তদেব। পৃ. ১৩৬।

৫৫. তদেব। পৃ. ১৩৯।

৫৬. তদেব। পৃ. ১৪০।

৫৭. তদেব। পৃ. ১৪১।

৫৮. শান্তিবালা রাভা (মহিলা, বয়স: ৫৮, পেশা: গৃহবধূ, গ্রাম: সুরিপাড়া, গ্রাম পঞ্চায়েত অঞ্চল: শালকুমার ২, জেলা: আলিপুরদুয়ার, সংগ্রহের কাল: ২২-০৮-২০১৮)।

৫৯. তদেব।

চতুর্থ অধ্যায়

রাভা জনজাতির অস্তিত্বের সংকট: অমিয়ভূষণ মজুমদারের কথাসাহিত্য

ভূমিকা

বাংলা সাহিত্যের একজন ব্যতিক্রমী লেখক অমিয়ভূষণ মজুমদার (১৯১৮-২০০১)। তাঁর ছোট থেকে বড় হয়ে ওঠা এবং গোটা কর্মজীবন কেটেছে কোচবিহার শহরেই। কোচবিহার জেলায় দীর্ঘদিন বাস করায় উত্তরবঙ্গের আদিবাসী সমাজকে তিনি অত্যন্ত কাছ থেকে দেখার সুযোগ পেয়েছিলেন। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জনজাতির মানুষের প্রতি তাঁর একটা আলাদা ভালোবাসার জায়গা ছিল। তাঁর কয়েকটি উপন্যাস এবং গল্পের মধ্যে দিয়ে উত্তরবঙ্গের আদিবাসী সম্প্রদায়ের সমাজ-সংস্কৃতি এবং তাদের অস্তিত্বের সংকটের কথা তুলে ধরেছেন অমিয়ভূষণ মজুমদার। উত্তরবঙ্গের এমনই একটি আদিবাসী সম্প্রদায় 'রাভা' জনগোষ্ঠী। তিনি তাঁর *সোঁদাল* (১৯৮৭) এবং *বিনদনি* (১৯৮৫) উপন্যাসে রাভা জনজাতির সমাজ ও সংস্কৃতির পরিচয় দিলেও *মাকচক হরিণ* (১৯৯১) উপন্যাসেই তিনি উত্তরবঙ্গের রাভা জনজাতির সামগ্রিক সংকটের কথা বলেছেন। সামগ্রিকভাবে বলা যায় যে এই তিনটি উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে রাভা জনগোষ্ঠীর জীবনকে তিনি তুলে ধরতে চেয়েছেন। তিনি রাভাদের উৎস, তাদের ভাষা, সংস্কৃতি, আচার-আচরণ, সমাজ-ব্যবস্থা, খুব কাছ থেকে পর্যবেক্ষণ করে সেই চরিত্রকে তুলে ধরেছেন উপন্যাসের পাতায়। উত্তরবঙ্গের আদিবাসীদের ভাষার সঙ্গে তিনি ছিলেন পরিচিত। অমিয়ভূষণ রাভাদের সামাজিক অবস্থা চিহ্নিত করে দেখিয়েছেন কিভাবে তারা সময়ের সঙ্গে হারিয়ে যাচ্ছে। বর্তমান আধুনিক সভ্য সমাজের সঙ্গে তাদের সংঘাত ও সমন্বয়গুলোকে তিনি এই উপন্যাসগুলিতে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এই অধ্যায়ে অমিয়ভূষণ মজুমদার তাঁর *মাকচক হরিণ* উপন্যাসটিতে রাভা জনজাতির যে অস্তিত্বের সংকটের কথা আমাদের শুনিয়েছেন তা আলোচনা করা হয়েছে।

অস্তিত্বের সংকট: 'মাকচক হরিণ'

অমিয়ভূষণ মজুমদারের *মাকচক হরিণ* (১৯৯১) উপন্যাসটি ১৩৯৮ বঙ্গাব্দের শারদীয়া *দৈনিক বসুমতী* 'তে প্রকাশিত হয়। এই উপন্যাসে তিনি রাভা জনজাতির অস্তিত্বের সংকটকে বিভিন্ন

দিক থেকে উপস্থাপিত করেছেন। রাভা উপজাতি উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ অঞ্চল থেকে কিভাবে ক্রমবিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে তা দেখানোই এই উপন্যাসে তাঁর অভিপ্রায়। রাভা জনজাতির ভূমি ও ভৌগোলিক অধিকারের সংকট, সংস্কৃতির সংকট, ভাষা সংকট, বিশ্বাসের সংকট এসব কিছু নিয়েই সংকটের একটা পূর্ণ রূপ পাওয়া যায় এই উপন্যাসে। রাভা সংস্কৃতি কীভাবে বিপন্নতার পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে এবং তাদের সংকটময় অস্তিত্বের কথা তিনি তুলে ধরেছেন এই উপন্যাসে। অর্থাৎ রাভা জনজাতির বিভিন্ন রীতি-নীতি, তাদের সমাজ ব্যবস্থা, তাদের সংস্কৃতিগুলি কিভাবে হারিয়ে যাচ্ছে তা তিনি দেখিয়েছেন এই উপন্যাসে।

অমিয়ভূষণ মজুমদারের উপন্যাস ও গল্প পাঠ করলে বোঝা যায় তিনি উত্তরবঙ্গের উপজাতির বাস্তব সমাজ জীবন তুলে ধরেছেন তার লেখায়। *মাকচক হরিণ* উপন্যাসে লেখক বিভিন্ন উপজাতির সার্বিক সংকটের কথা তুলে ধরেছেন। প্রকৃতিকে সঙ্গে নিয়েই শুরু হয়েছে *মাকচক হরিণ* উপন্যাসটি। উপন্যাসের শুরুতে লেখক নীল-কুয়াশায় ঘেরা একটি রহস্যময় স্থানের বর্ণনা এবং লোককথার মধ্যে দিয়ে উত্তরবঙ্গের রাভা উপজাতির সংকটের কথা আমাদের জানিয়েছেন। *মাকচক হরিণ* উপন্যাসের পটভূমিতে রয়েছে উত্তরবঙ্গের রাভা নামক এক কৌম জনজাতি কথা।

রাভা জনজাতির পরিচয় এবং বাসস্থানের মধ্যে দিয়েই উপন্যাসটি শুরু করেছেন লেখক –"ওই হাতি-তল্লিজোড়া, সকালের নীল নীল কুয়াশার দরুন যাদের বিরাট ছাতার মতো মাথাদুটো জোড়া মনে হয়, আর তার ফলে এরকমও মনে হয় উত্তর-পশ্চিমের যে নীল পাহাড়ের ঢেউ পরিষ্কার দিনে দেখা যায়, কুয়াশার ফলে তাই কাছে নেমে এসেছে নীলাভ সবুজ হয়ে...এখন বন কোথায়? বাহির-গুড়িকে মরা রায়ডাক পৃথক করে, বাহির করে দেয়ার পর ওই নাম। কিন্তু গুড়িটা রাভা শব্দ নয়। অন্দরম শেষে মেচপাড়া, আর বাহিরগুড়ি এখন আমোদনগর।"[১]

উপন্যাসের শুরুতেই তিনি রাভা জনজাতির পরিবর্তনের একটা ইঙ্গিত দিয়েছেন। অমিয়ভূষণ মজুমদার রাভা জনজাতির যে পরিবর্তন দেখিয়েছেন তাঁর উপন্যাস এবং গল্পে সেখানে তাঁর নিজস্ব স্বাতন্ত্র্যতা রয়েছে একথা বলাই যায়। উত্তরবঙ্গের কোচবিহার জেলায় দীর্ঘদিন বসবাস করায় উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন উপজাতির মানুষদের তিনি খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ পেয়েছেন। তিনি তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় উপজাতিদের যে পরিবর্তনগুলি লক্ষ করেছেন তাই হয়তো তাঁর লেখার মধ্যে দিয়ে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন।

এবিষয়ে উল্লেখ করা যেতে পারে রাভাদের আত্মার সদ্‌গতি সংক্রান্ত 'চিকাবাইরাই' নামক প্রথার কথা। তিনি তাঁর উপন্যাসে দেখিয়েছেন রাভা বিশ্বাস অনুযায়ী তাদের আত্মার উৎসস্থল প্রকৃতির কোনো বস্তু যেমন- পাহাড়, ঝর্না, নদী, নালা ইত্যাদি। মৃত্যুর পর সেই আত্মা আবার উৎসস্থলেই ফিরে যায়। সুমিতা চক্রবর্তী লেখকের এই বক্তব্যের সঙ্গে একমত হতে পারেননি। তিনি *মাকচক হরিণ* সমালোচনা প্রসঙ্গে *অমিয়ভূষণ মজুমদার ও আদিবাসী চেতনা* প্রবন্ধে এবিষয়ে ব্যাখা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। তিনি রাভা জনজাতি বিষয়ক বিভিন্ন গবেষণা গ্রন্থের নাম উল্লেখ করে দেখিয়েছেন যে এই 'চিকাবাইরাই' নামক প্রথার উল্লেখ রাভা বিষয়ক গবেষণা গ্রন্থগুলিতে নেই। বিভিন্ন জনগোষ্ঠী ও লোকায়ত সংস্কৃতি নিয়ে যারা কাজ করেছেন তাদের সাথে কথা বলে প্রাবন্ধিক জেনেছেন 'চিকাবাইরাই' সঙ্গে তাদের পরিচয় নেই। তবে তারা জানিয়েছেন এই ধরনের বিশ্বাস বা কল্পনা যে কোনো জনজাতির মধ্যে থাকা ও অসম্ভম নয়। এপ্রসঙ্গে সুমিতা চক্রবর্তী 'অমিয়ভূষণ মজুমদার ও আদিবাসী চেতনা' প্রবন্ধে তাঁর অভিমত প্রকাশ করেন –"রাভা উপজাতির পুরুষেরা জীবৎকালে জানতেও পারেন না নিসর্গের অন্দরমহলে কোন অবয়বে, কোথায় আছে তাঁর চিকাবাইরাই। সেকথা জানেন কেবল পরিবারের কোন নারী। বহিরাগত সেই গবেষক হয়তো পৌঁছাতেই পারেন না সেই নারীর কাছে। তাই তাঁরা জানতেও পারেন না চিকাবাইরাই কী? অমিয়ভূষণ মজুমদার দীর্ঘকাল সন্নিহিত বসবাসের সূত্রে কোনোভাবে হয়তো জেনে গিয়েছিলেন এই অপরূপ কল্প-কথা যা রাভা আদিবাসীকে আত্মার বন্ধনে বেঁধেছে অরন্য- প্রকৃতির সঙ্গে। তবু, সত্যিই চিকাবাই রাই বলে কিছু আছে কিনা তা এখনও সন্ধান সাপেক্ষ।"[২] এই আলোচনা থেকে একথা বলা যায় যে 'চিকাবাইরাই' নামের যে প্রথার কথা অমিয়ভূষণ তাঁর *মাকচক হরিণ* ও *বিনদনি* উপন্যাসে উল্লেখ করেছেন তা কখনোই সম্পূর্ণভাবে লেখকের কল্পনা প্রসূত নয়, এর বাস্তব ভিত্তি রাভা সমাজে নিশ্চিত ভাবে ছিল।

মাকচক হরিণ উপন্যাসে লেখক হরিণের মধ্যে দিয়ে রাভা সম্প্রদায়ের অস্তিত্বের সংকটের কথা এবং তাদের ক্রমবিলুপ্ত ইতিহাসের দিকটি তুলে ধরেছেন। সেই দিক দিয়ে বিচার করলে উপন্যাসের নাম সঙ্গতিপূর্ণ বলে মনে হয়। সুমিতা চক্রবর্তী বলেছেন এই হরিণ যে কোনো হরিণ নয়, তা 'মাকচক' অর্থাৎ –"এক রাভা হরিণ।"[৩] উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র প্রদ্যুম্নের বৃদ্ধ মামা বীজেন্দ্র দালো (রাভা) একটি হরিণ পুষেছিল। বীজেন্দ্র দালো হরিণটি প্রদ্যুম্নের দ্বিতীয় বিবাহ উৎসবে তার শ্বশুর-শাশুড়ির জন্য পাঠিয়ে দেয়। হরিণটিকে প্রদ্যুম্নের পরিবারের লোকেরা খুবই ভালবাসত। আত্মীয়-স্বজনের মত হরিণটিকে লালন পালন করত। প্রীতি থাকা সত্ত্বেও হরিণ কিন্তু

একক এবং নিঃসঙ্গ। তার কোনো সঙ্গিনী নেই, নেই কোনো সুখ-দুঃখের সাথী। রাভা ভাষায় উল্লেখিত এই হরিণ যেন তাদের সম্প্রদায়ের প্রতীক। যার নিশ্চিন্ত বিলুপ্তি ছাড়া অন্য কোনো ভবিষ্যত নেই। এই তাইতো লেখক প্রদ্যুম্নের মুখে বসিয়েছেন –"মামা, এক কাজ কর। যত পয়সা লাগে মাকচকটাকে ছাড়ি দে। দূর বনে নিয়া যা। এটে নাই দোসর, নাই হরিণী, দেখ হয়তো আট-নাও বছর হয়া যায়। উয়াক ছাড়ি দে, মামা। বনৎ চলি যাক। ছাড়ি দে।"[৪]

অমিয়ভূষণ তাঁর *মাকচক হরিণ* উপন্যাসে মধ্যে দিয়েও রাভা জনজাতির বিভিন্ন সংকটের কথা আমাদের শুনিয়েছেন। তার মধ্যে অন্যতম একটি ভূমি সংকট। এই উপন্যাস থেকে আমরা জানতে পারি কিভাবে রাভা জানজাতির মানুষেরা ভূমি থেকে উৎখাত হয়েছিল। রাভা জনজাতির প্রধান জীবিকা ছিল কৃষিকাজ। কৃষিজমি থেকে উৎপাদিত ফসলের উপরেই তাদের সারাবছর নির্ভর করতে হতো। জমির উত্তরাধিকারী হত মেয়েরা। পুরুষের কাজ ছিল স্ত্রীর জমিতে চাষ করা, ফসল ফলানো এবং হাতির হাত থেকে ফসল রক্ষা করা। লেখক উপন্যাসে দেখিয়েছেন যে রাভা সমাজে জমিই ছিল নারীর একমাত্র সম্পদ সে সমাজ থেকে কিভাবে জমি হস্তান্তরিত হচ্ছে এবং কিভাবে তাদের জমির উত্তরাধিকারী নারীর হাত থেকে পুরুষের হাতে যাচ্ছে। এর কারণ হল তাদের জমির কোনো সরকারি কাগজপত্র না থাকায় জমি চলে যায় অন্যদের হাতে। সামান্য কিছু টাকা দিয়ে লেখাপড়া জানা মানুষরা তাদের উদ্বাস্তু করে দেয়। তাই তারা সহজেই হয়ে যায় ভূমিহীন।

রাভা সমাজ সাধারণতভাবে মাতৃকূলাধীন বা মাতৃকূল ধারার অনুসারী হওয়ায় জমি সংক্রান্ত ধারণা ছিল একটু বেশি জটিল। জমির উত্তরাধিকার মায়ের কাছ থেকে মেয়ের কাছে আসত। রাভা সমাজে পুরুষদের জমিতে অধিকার থাকত না। কিন্তু জমি চাষ করা থেকে ফসল ফলানো একা নারীর পক্ষে করা সম্ভব ছিল না তাই প্রয়োজন হত পুরুষের। এই পুরুষ হত স্বামী, পুত্র, কখনো বা জামাই। প্রকৃতপক্ষে রাভা নারীর জমি কন্যার সঙ্গে জামাতারই যুগ্মভাবে প্রাপ্য হয়। কিন্তু পুত্র মায়ের জমি পায় না। ঔপন্যাসিক অমিয়ভূষণ *মাকচক হরিণ* উপন্যাসে বলেছেন কখনো কখনো এমন পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে কোনো কারণবশত কোনো পরিবারে স্বামী এবং মেয়ে মারা গেলে জমিরক্ষার প্রয়োজনে শাশুড়ি জামাইকে বিয়ে করে। উপন্যাসে এমনই একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করে অমিয়ভূষণ আমাদের শুনিয়েছেন রাভা পরিবারের মেয়েদের সাহসী পদক্ষেপের কথা তিনি বলেছেন রাভা মেয়েদের অন্যরকম সাহস আছে, পুরুষ না পেলে, দুর্ভাগ্যে যদি স্বামী মারা যায়, নিজের মেয়ে মারা যায়, তা হলে জামাইকে বিয়ে করতে পারে রাভা শাশুড়ি।

আর কোনো জাতি আজ পর্যন্ত এমন কোনো সাহস দেখাতে পারেননি বলে লেখক মন্তব্য করেন। তবে অনেক গবেষক লেখকের এই মন্তব্যে একমত হতে পারেননি। তাই লেখকের এই মন্তব্য নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়। *মাকচক হরিণ* উপন্যাসে আমরা দেখতে পাই প্রদ্যুম্নের মা বিদুনবালা 'কিলাংনানি প্রথাকে আশ্রয় করে জামাইকে বিয়ে করেন। বিদুনবালার স্বামী চকোৎ (মদ) খেয়ে মারা যায়। অন্যদিকে শূকর থেকে ছড়ানো রোগে বিদুনবালার বিবাহিত যুবতি মেয়ে মারা যায়। বিদুনবালার হাতে পঁয়ত্রিশ বিঘা জমির মালিকানা। জমি রক্ষনাবেক্ষনের জন্যই বিদুনবালা জামাইকে বিয়ে করেন। প্রদ্যুম্ন বিদুনবালার দ্বিতীয় বিবাহের সন্তান।

এছাড়াও রাভা সমাজের ভূ-সম্পত্তির জটিলতা বৃদ্ধির অন্যতম আরেকটি কারণ লেখক দেখিয়েছেন তা হল ধর্মান্তরিত হওয়া। আদিবাসীরা সাধারণত তাদের আদি ধর্ম প্রকৃতি পূজায় বিশ্বাস ও পদ্ধতি ত্যাগ করে নিকটবর্তী বৃহৎ জনগোষ্ঠীর ধর্ম সাধারণত হিন্দু, ইসলাম, খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করছে। এর মূল কারণ হল তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার লড়াই। ফলে ধর্মান্তরিত রাভাদের মধ্যে ভূ-সম্পত্তিজনিত সমস্যা বেড়ে গেলো অনেকগুণ। কেননা রাভা সমাজে মায়ের জমি পায় মেয়েরা। অন্য সমাজে পিতার জমি পায় পুত্ররা। ধর্মান্তরিত রাভাদের মধ্যে বেঁধে গেল দ্বন্দ্ব তারাও জমির মালিকানা দাবি করল ফলে নিজেদের মধ্যে সমস্যা দেখা দিল। এছাড়াও তাদের জমির নিজস্ব কোনো কাগজপত্র না থাকায় খুব সহজেই চলে যায় অন্যদের হাতে। যে রাভাদের শ্বাস-প্রশ্বাসে ছিল জমি শেষে তারাই কিনা দিনমজুরি কাজ বেছে নিচ্ছে। ধর্মান্তরিত হওয়ার তাদের সমাজের সামাজিক কাঠামো ভেঙ্গে গেছে। পিতার জমি ছেলেরা পেয়ে থাকে। অমিয়ভূষণ তাঁর এই উপন্যাসে এই পরিবর্তনটাই দেখিয়েছেন।

উপন্যাসে কাহিনিতে বম্‌ভোলা বলে এক চরিত্রকে আমরা পাই সে রাভা সম্প্রদায়ের। সে শিক্ষিত এবং কর্মসূত্রে ডাকবিভাগে চাকরি করে সমাজ এবং রাজনীতি বিষয়ে সে সচেতন একজন মানুষ। ধর্মান্তরিত হয়ে সে ইসলামধর্ম গ্রহণ করেছে। সে রাভা সমাজের অধিকার ফিরে পাওয়ার জন্য লড়াই করে। রাভা সমাজের শিক্ষিত মানুষেরা যে ধর্মান্তরিত হচ্ছে লেখক বার বার সে বিষয়টি তুলে ধরেছেন উপন্যাসে।

উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র শ্যামাচাঁদের ঠাকুরদার বক্তব্য অনুযায়ী প্রায় ষাট বছর আগে আসাম থেকেই এক ঠাকুর শর্মা এসেছিলেন তার কাজ ছিল রাভা সমাজটাকেই হিন্দু করা। অমিয়ভূষণ শ্যামাচাঁদের সংলাপে এবিষয়টি তুলে ধরেছেন –"এখানে যারা কোচ বলত নিজেদের তখন, এখন

বলে না, তারা তো রাজার সঙ্গে হিন্দু। তখন এই গ্রামের অনেক রাভা হিন্দু হয়েছিল। ...তো হিন্দু হওয়ার একই কথা। বাড়িঘর পরিষ্কার রাখা লাগবে। বাড়ির নিচুতলায় শূকর রাখা না যাইবে, আর চকোৎ (মদ) খাওয়া না যাইবে, আর কৃষ্ণক পূজা করা লাগিবে। প্রথম জমি ওয়ালা কয়েক রাভা হিন্দু হইল। স্বামী হিন্দু হইলে রাভার বেটিছাওয়া বা কি করে? তার দেখা দেখি যার জমি কম, তেমন রাভাও কৃষ্ণভকত।"[৫]

রাভা সমাজ মাতৃপ্রাধান্য হওয়ায় জমির উপর নারীর অধিকার থাকত। রাভা পুরুষের কাছে নারী এবং জমি ছিল সমার্থক। নারী হারালে তাদের জমির অধিকারেও টান পড়ে। রাভা সমাজের এই নীতির সূত্র ধরে উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র বিন্দের মৃত্যুর পর তার স্বামী জনু খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করে। লেখক বমভোলাড় সংলাপে বিষয়টি তুলে ধরেন – "বিন্দের মৃত্যুর পরে এক বছর ছিল জনু শাশুড়ির বাড়িতে। তারপর তার মামার সঙ্গে আসাম। নৌকরি? কাউকে বলে নাই, কেন। ইস্কুল ছাড়ল, তেমন শাশুড়িকে ছাড়ল। তার কি মনে হয়েছিল, বিন্দের মৃত্যুর জন্য সেই দায়ী? সব চাইতে বুদ্ধিমান, সব চাইতে লেখাপড়ায় ভালো। সে জন্যই কি জনু-জনাদ্দন থেকে খিস্টান জন।"[৬]

পাঁচ বছর পর যখন জনু শ্বশুর বাড়িতে ফিরে আসে তখন শ্বশুরবাড়িতে সে অনেক বদল দেখতে পায়। শ্বশুর মরেছে তাঁর শাশুড়ি বিনদনি একা। জনু শাশুড়ির জমিতে চাষবাস শুরু করে। স্বামী মারা যাওয়ার পর বিনদনির চেহারার অনেক পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। বাঙালি বিধবা মহিলাদের মতো সরুপাড় সাদা শাড়ি পরা। স্বামী মারা যাওয়ার দু-বছরের মধ্যে বিনদনির চুলে পাক ধরেছে। রাভা নারীরা যতই জমির উত্তরাধিকারী হোক না কেন পুরুষ ছাড়া রাভা নারীদের বেঁচে থাকা যে কত কষ্টকর ছিল বিনদনি চরিত্রের মধ্যে দিয়ে লেখক দেখানোর চেষ্টা করেছেন।

লেখক রাভা সমাজের মানুষদের মধ্যে হিন্দু ধর্মে ধর্মান্তরিত হওয়ার বিষয়টি বারবার উপন্যাসে উল্লেখ করেছেন। রাভা সমাজের মানুষেরা তাদের ধর্ম থেকে বেরিয়ে এসে হিন্দুধর্ম, খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করছে। শ্যামাচাঁদের ঠাকুরদা এবিষয়ে তার নিজের অধিকারী হয়ে ওঠার কথা ব্যক্ত করেন, "তো সেই তোর ঠাকুরমা আর আমি একই সঙ্গে শর্মার কাছে দীক্ষা নিয়ন্ত হিন্দু হই। সেই শর্মা আসামৎ ফিরি যায় দশ বছর বাদে। কাঁয় রাখে মন্দির, কাঁয় করে পূজা? তো আমাক কৃষ্ণ পূজার মন্ত্র দিয়া, রাভা মানুষকে হিন্দু করার অধিকার দিয়া, অধিকারী করি গেইল।"[৭] শ্যামাচাঁদের সংলাপ থেকেই আমরা জানতে পারি অনেক রাভা পরিবারের রাভা থেকে হিন্দু হয়ে ওঠার কাহিনি। রাভা

পদবি থেকে অনেকে দাস হয়ে গেলেন। ধর্মান্তরিত হওয়ার পরও কিন্তু সমস্যা থেকেই গেল সমস্যা দাঁড়ালো চকোৎ আর বিবাহকে কেন্দ্র করে। চকোৎ (মদ) তারা ছাড়তে পাড়লো না। ধর্মান্তরিত হওয়ার আগে রাভা নারীরা যেখানে জমির মালিক ছিল ধর্মান্তরিত হওয়ার পর পুরুষরা হল জমির মালিক। ধর্মান্তরিত হওয়ার ফলে রাভা নারীদের বিবাহের জন্য পুরুষ পাওয়া সমস্যা হয়ে দাঁড়ালো। অমিয়ভূষণ রাভা জনজাতির এই সমস্যাগুলো *মাকচক হরিণ* উপন্যাসের গভীরভাবে বিশ্লেষণ করেছেন।

এই উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে লেখক রাভা ভাষার সংকটের কথা তুলে ধরেছেন। সময়ের সঙ্গে কিভাবে তাদের ভাষা হারিয়ে যাচ্ছে এবং কেনো তারা অন্য সমাজের ভাষার দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে এই দিকটি অমিয়ভূষণ আলোচনা করেছেন। লেখক দীর্ঘদিন কোচবিহার জেলায় বসবাস করায় উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভাষার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। তিনি একটি সাক্ষাৎকারে এবিষয়ে মন্তব্য করেন – "স্কুলে আমার সহপাঠীদের মধ্যে কোচ ও রাজবংশী ছিল। মেচ, রাভা, ওরাঁ ছিল না। সহপাঠীদের আমার সহপাঠীই মনে হত। তাদের নিজস্ব সুমিষ্ট ভাষা ছিল। সে ভাষায় তাদের সঙ্গে কথা বলতাম। আমার পরিবার নববিধান ব্রাহ্মঘেঁষা ছিল আর কোচ ও রাজবংশীরা প্রবলভাবে হিন্দু ছিলেন। তারা অতিশয় সৌহার্দ্যপূর্ণ অভিজাত স্বাতন্ত্রের অধিকারী ছিলেন। তাঁদের মধ্যে inferiority complex ছিল না। কোচবিহারে বৈশিষ্ট্য ছিল আচার ব্যবহারে সৌজন্য আমরা যারা বহিরাগত ছিলাম তারাও অধিকাংশই বিষয়টাকে সহজভাবে নিজেদের করে নিতাম।"[৮]

মাকচক হরিণ উপন্যাসের চরিত্র শ্যামাচাঁদের সংলাপের মধ্যে দিয়ে লেখক রাভা জনজাতির ভাষা সংকটের কথা তুলে ধরেছেন – "রাভা ভাষার উপর রাজবংশী ভাষা চাপছে। এখন তার সেই রাজবংশী ভাষার উপর ফিন রেডিওর ভাষা। তার উপর খানিক ইংরেজি এখন একজনা যুবক যুবতী নাই যে রাভা ভাষায় একটা শব্দ জানে। হয়তো মুই জানং। হয়তো তোর বাবা কাকা একটা-দুটা শব্দ জানে, হয়তো বিনদনির বাড়ির সেই দুদিয়া-দুখদিয়া জানে। আড় কই?"[৯] রাভা ভাষার উপর রাজবংশী এবং বাংলা ভাষার যে প্রভাব অমিয়ভূষণ লক্ষ করেছিলেন তা তিনি এই উপন্যাসে দেখিয়েছেন। বিশেষ করে রাভাবসতি অঞ্চলগুলিতে রাজবংশী ভাষার এতটাই প্রভাব যে তারা তাদের নিজের ভাষা ভুলে গিয়ে রাজবংশী ভাষা গ্রহণ করছে। রাভা মানুষেরা তাদের ভাষার উচ্চারণ তারা ভুলে যাচ্ছে সেই দিকটিও লেখক তুলে ধরেছেন। উপন্যাসে লেখক জানিয়েছেন বর্তমানের রাভা ছেলে মেয়েরা দু-একটা শব্দের সাথে পরিচয় থাকলেও সেরফাং

শব্দের মানে যানে না। রাভা ভাষা যে সংকটের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে লেখক তা বারবার দেখানোর চেষ্টা করেছেন আলোচ্য উপন্যাসে।

রাভা সমাজের মানুষদের উচ্চবর্ণের মানুষের কাছে তাদের সবসময় অপমান সহ্য করতে হত। তাই অনেক শিক্ষিত রাভা মানুষেরা বাধ্য হয়ে পদবি পরিবর্তন করেন। উপন্যাসের প্রদ্যুম্ন সিং নামে এমনই এক শিক্ষিত রাভা যুবকের পরিচয় পাই। সে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরি পেয়েছে। কিন্তু সে কর্মক্ষেত্রে বার বার উচ্চবর্ণের মানুষের দ্বারা অপমানিত হয়। অপমান থেকে বাঁচার জন্য চাকরি জীবনে প্রবেশ করেই দালো (রাভা গোত্র) থেকে এফিডেভিট করে সিংহ পদবি নেয়। তা সত্ত্বেও সে অপমানের হাত থেকে রেহাই পায়নি। লেখক অমিয়ভূষণ তার মুখে শুনিয়েছেন আক্ষেপের কথা –"তুমি জানো না, ঊষা, সিংহ- পরাক্রম রাজা হয়ে সিংহ হওয়া। আর এফিডেবিটের সিংহ এক হয় না। তুমি জানো না, ঊষা, সেই স্কুলের সময় থেকে, এই আই.এ.এস অফিসার পর্যন্ত সহপাঠীদের, সহকর্মীদের, রাভা শিডিউল হয়ে কেউ বিশেষ সুবিধাভোগী, এরকম চাপা চাপা বিদ্রূপ কেমন লাগতে পারে।"[১০]

প্রদ্যুম্ন সিং এই কথাগুলো স্ত্রী ঊষাকে বলতে গিয়েও বলতে পারেনা মনের মধ্যে চাপা দিয়ে রেখে দেয়। তার মনের ভেতরে যে একটা গভীর ঝড় বইছে তা সে প্রকাশ করতে পারে না। স্ত্রী ঊষাকে বললে হয়তো তার কাছেও সে অপমানিত হবে এই ভয়ও তার অন্তরে ছিল। তবে পরবর্তীতে আক্ষেপের সুর থেকেই সে স্ত্রীকে জানায় আই. এ. এস. হতে গেলে সিডিউল হতে হয় না। এথনোলজি, সোশিওলজি এবং ইংরেজি প্রবন্ধে সে ভালো উত্তর করেছিল বলেই সে আই. এ. এস. হতে পেরেছে। স্ত্রীর কাছে সে প্রশ্ন রেখেছে তাদের সন্তানদের নিঃসঙ্গ রাভা সিডিউল হওয়ার দরকার আছে কিনা?

অস্তিত্বের সংকট: সোঁদাল

সোঁদাল (১৯৮৭) উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩৯৪ বঙ্গাব্দে *প্রতিক্ষণ* পত্রিকায়। পরে বই আকারে প্রকাশিত হয় (শারদীয়া) ১৩৯৫ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে। উপন্যাসটিতে লেখক রাভা সমাজের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। এই উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে তিনি রাভা সম্প্রদায়ের জনজীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা আমাদের শুনিয়েছেন। কিভাবে

তাদের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের পরিবর্তন ঘটে চলেছে তা তিনি এই উপন্যাসে দেখিয়েছেন। মরুচমতী নদী, তুরুককাটা শহর, ডাউকিমারি ব্লক, হাতকাটা, হাদলমারি, লাউতামা এই নামগুলি বার বার এসেছে এই উপন্যাসে। এই উপন্যাস আলোচনা প্রসঙ্গে তপোধীর ভট্টাচার্য তাঁর *সোঁদাল: ভঙ্গুর সত্তার আখ্যান* প্রবন্ধে বলেছেন –"'সোঁদাল'কে ভাবা যেতে পারে অমিয়ভূষণের মাতৃভূমি আবিষ্কারের গল্পহীন গল্প। শুরু থেকেই প্রকট ও প্রচ্ছন্ন ভাবে সভ্যতার যে সমালোচনা উপস্থাপিত করেছেন তিনি, তার তাৎপর্য গভীরভাবে অনুধাবন করতেই হয়। সচেতন ভাবে হোক বা অবচেতন ভাবে, আপদগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর মানুষেরা প্রতিনিয়ত যে অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে ব্যাপৃত থাকে, তাদের আদিবাসী বলে চিহ্নিত করা হয় কিন্তু সে অভিধার যোগ্যমান্যতা দেওয়া হয়না কখনোই। এই জন্যে পর্বে-পর্বান্তরে তারা ভারত নামক দেশের মূল জনস্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েই থাকে। তাদের কোনো মৌলিক অধিকারই স্বীকৃত হয়না; বরং কালস্রোতে ভেসে যায় সবকিছু।"[১১]

সোঁদাল উপন্যাসের কাহিনি মূলত আবর্তিত হয়েছে মোন্নাতকে কেন্দ্র করে। মূলকাহিনি হিসেবে উঠে এসেছে কৈচন্দ্র এবং তিন্নির কাহিনি। নায়ক মোন্নাতের অতীত এবং বর্তমানের মধ্যে দিয়ে তিনি রাভা জনজাতির বিভিন্ন সমস্যার কথা আমাদের বলেছেন। এই উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে লেখক উত্তরবঙ্গের রাভা সমাজ ব্যবস্থায় জমির সাথে নারীর সম্পর্ক এবং অরণ্যের সঙ্গে তাদের যে একটা আত্মিক সম্পর্ক রয়েছে তা উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে দেখানোর চেষ্টা করেছেন। পরবর্তীতে কিভাবে জমির মালিকানা থেকে নারীর প্রাধান্য কমে গেল এ বিষয়ে তিনি গভীরভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। উপন্যাসে লেখক দেখিয়েছেন রাভা গ্রামগুলির বেশিরভাগেই গড়ে উঠেছিল অরণ্যকে কেন্দ্র করে। তিনি লক্ষ করেছিলেন অরণ্যের বিলুপ্তি ফলে রাভা জনজাতির মানুষের জীবনে কি পরিমাণে সংকট নেমে এসেছিল এবং যে রাভা সমাজে একসময় অরণ্যই ছিল সমাজ-সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র, সেই রাভা সমাজ কিভাবে অরণ্যের অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে এই প্রশ্নগুলি তিনি উপন্যাসে তুলেছেন। রাভা গ্রাম আর অরণ্যকে নিয়েই এই উপন্যাসের কাহিনি গড়ে উঠেছে। উপন্যাসের চরিত্রগুলির মধ্যে দিয়ে লেখক অরন্যের সঙ্গে রাভা সমাজের যে সম্পর্ক ছিল তা তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। উপন্যাসে দেখি তিন্নি এক বন থেকে উৎখাত হয়ে অন্য বনে এসে আশ্রয় নিয়েছে। রক্তের সঙ্গে মিশে থাকা অরণ্যকে রাভা সমাজের মানুষেরা অস্বীকার করতে পারেনি। বারবার তারা অরণ্যের অধিকার ফিরে পাওয়ার চেষ্টা করেছেন। উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র মোন্নাতের মুখ থেকে শুনতে পাই –"বনকে রক্ষা করলে বন তোমাকে রক্ষা করে।"[১২] রাভাদের

ধান খেতের পাশেই থাকত বন তাই খুব সহজেই রাভা জনজাতির মানুষের সাথে বনের একটা সম্পর্ক গড়ে ওঠে। শুধু রাভা নয়, কোচ রাজবংশীদের সঙ্গেও লেখক বনের একটা সুসম্বন্ধ দেখিয়েছেন। রাভা বসতি গ্রামগুলি অরণ্যের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে গড়ে উঠেছে। এই অরণ্যগুলি রাভা জনজাতির মানুষদের কিভাবে রক্ষা করেছিল লেখক মোন্নাতের সংলাপের মধ্যে দিয়ে আমাদের শুনিয়েছেন।

রাভা সমাজে নারীর সঙ্গে জমির একটা আত্মিক যোগ রয়েছে এই উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে লেখক তা দেখানোর চেষ্টা করেছেন। উপন্যাসটিতে আমরা দেখি পঙ্কিনী রাভার একই মাসে স্বামী ও মেয়ের মৃত্যু হয়। স্বামী, মেয়ে মারা যাওয়ার পর পঙ্কিনী কীভাবে তার জমি রক্ষা করবে সে বুঝে উঠতে পারে না। তাই তিনি বাধ্য হয়েই জমি রক্ষার জন্য সংকটময় মুহূর্তে অল্প বয়সী জামাইকে স্বামী হিসাবে গ্রহণ করে। রাভা পুরুষের কাছে যেন নারীই সব। নারী হারালে তাদের জমি অধিকারে টান পড়ে। রাভা পুরুষেরা যেন রাভা নারীর শরীরের শান্তি খুঁজে পায় জমির মধ্যে দিয়ে। রাভা নারীর জমিতে পুরুষের কৃষিকাজ করার পর শিকার ছাড়া আর তেমন কোনো কাজই থাকে না। কৃষিজমির ফসলকে হাতির হাত থেকে রক্ষা করার দায়িত্ব ছিল রাভা পুরুষের। *সোঁদাল* উপন্যাসে লেখক এপ্রসঙ্গে বলেছেন –"কী করবে, কেন, তোমরা রাভার বেটা? রাভার বেটির নয় তো ধানখেত থাকিল্। হাঁতি আইসে, রুখিবে? ভৈষী ঢোকে ধানখেতৎ, পেনটি ধরি টানো? বুনা শুয়োর আইসে ধানবাড়ি? বন কোটে?"[১৩] কিন্তু সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে রাভা সমাজেও জমি হস্তান্তরিত হতে দেখা যায়। জমির মালিকানা পুরুষের হাতে চলে যায়। লেখক এই পরিবর্তনটাই দেখিয়েছেন এই উপন্যাসে।

এই উপন্যাসের আরেক চরিত্র মলগুঁর মধ্যে দিয়েও লেখক তাদের সমাজের বদল দেখিয়েছেন। মলগুঁর কথা থেকেই আমরা জানতে পারি তার শাশুড়ি তাকে তার স্ত্রীর গ্রামে নিয়ে আসে। সমাজ সচেতন মলগুঁ সে তার জাতির ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা করে। রাভা থেকে যারা পদবী পরিবর্তন করে দাস বা বৈষ্ণব পদবী গ্রহণ করে তাদের মধ্যে অনেক সমস্যা দেখা দেয়। মলগুঁ জানায় বৈষ্ণব হওয়ায় কিছু অসুবিধা আছে। রাইন্তক পূজা লক্ষ্মী রূপে পূজিত হয়। সেখানে চকোৎ এবং শূকরের মাংস দেওয়া যায় না। কিন্তু রাভা সমাজে যেখানে রাইন্তক পূজায় চকোৎ এবং শূকরের মাংস দেওয়া ছিল আবশ্যক। পদবী পরিবর্তন হওয়ায় এই সমস্যা ভয়ানক হয়ে দেখা দেয়।

মোন্নাত যখন মলগুঁর কাছে জানতে চায় যে তোমার গোত্র কার? তখন সে জানায় সে মায়ের গোত্র পেয়েছে। তার ছেলেমেয়েরা তারা তাদের মায়ের গোত্র পাবে। রাভা সমাজে একসময় গোত্র নির্ধারিত হত মায়ের দিক থেকেই মলগুঁর সংলাপ দিয়ে লেখক স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন এই উপন্যাসে। রাভাদের আত্মার সদ্‌গতি সংক্রান্ত 'চিকাবাইরাই' নামক প্রথার কথা আমরা *সোঁদাল* উপন্যাসে ও মোন্নাতের সংলাপের মধ্যে দিয়ে জানতে পারি। সব রাভাই জানে তার চিকাবাইরাই আছে। মৃত্যুর আগের মুহূর্তে রাভা সমাজের মানুষেরা জানতে পারে তার চিকাবাইরাই' কোথায় আছে। আর এই চিকাবাইরাই এর কথা রাভা জননীই একমাত্র জেনে থাকে। সারাজীবন রাভা জননী মনের গোপনে চিকাবাইরাই কথা লুকিয়ে রাখে। জননীর মৃত্যুর সম্ভাবনা দেখা দিলে সে মাতৃসম অন্য কোনো রমণীকে বা তার স্ত্রীকে গোপনে চিকাবাইরাই নামক প্রথার কথা বলে যান। রাভা সমাজের মানুষেরা চিকাবাইরাই নামক প্রথার সঙ্গে পরিচিত ছিল মলগুঁর সংলাপ থেকেই তা আমরা জানতে পারি –"কোন রাভার চিকাবায়রাই নাই থাকে? কেমন রাভা সে?"[১৪] অমিয়ভূষণ মজুমদার উত্তরবঙ্গে দীর্ঘদিন বসবাস করায় উত্তরবঙ্গের রাভা সম্প্রদায়ের মানুষদের তিনি খুব কাছ থেকে দেখেছেন এবং রাভা জনজাতির দৈনন্দিন জীবনের সাথে তিনি খুবই ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন। একারণেই হয়তো তিনি জানতে পেরেছেন তাদের চিকাবাইরাই নামক প্রথার কথা। কিন্তু বর্তমান রাভা সমাজে এই প্রথার প্রচলন দেখা যায় না। উত্তরবঙ্গের রাভা জনজাতির মানুষেরা সবদিক দিয়েই যে একটা অস্তিত্বের সংকটের মুখে এসে দাঁড়িয়ে এই উপন্যাসে স্পষ্টভাবে আমরা দেখতে পাই। এই উপন্যাস আলোচনা প্রসঙ্গে তপোধীর ভট্টাচার্য তাঁর *সোঁদাল: ভঙ্গুর সত্তার আখ্যান* প্রবন্ধে বলেছেন –"আগ্রাসী পুঁজিবাদ যখন প্রযুক্তির নখর প্রহারে আরণ্যক সভ্যতাকে ফালাফালা করতে চাইছে, মাতৃতান্ত্রিক রাভা গোষ্ঠীর মানুষ যে প্রতিকারহীন বিপন্নতার মুখোমুখি- সেই উপলব্ধিকে অমিয়ভূষণ আখ্যানে রূপান্তরিত করেছেন। নৃতাত্ত্বিক নিরিখে যে সব জনগোষ্ঠী 'অতিআপতগ্রস্ত' বলে অভিহিত হচ্ছে। তাদের অন্যতম 'সোঁদাল' এর গণমানুষ।"[১৫]

অস্তিত্বের সংকট: বিনদনি

অমিয়ভূষণ মজুমদারের *বিনদনি* (১৯৮৫) উপন্যাসটি ১৩৯২ বঙ্গাব্দে *সপ্তাহ* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই উপন্যাসের মধ্যে দিয়েও তিনি রাভা জনজাতির সঙ্গে পাঠকের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। এই উপন্যাসের তিনি রাভা সমাজের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিচয় তুলে ধরে তাদের সংকটের

কথা বলেছেন। এই উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে তিনি দেখাতে চেয়েছেন রাভারা কোথা থেকে এলো? তাদের পরিচয় কি? এবং পরবর্তীতে তারা কোথায় গেল? এসব প্রশ্নের মধ্যে দিয়ে লেখক তাদের অস্তিত্বের সংকটের কথা তুলে ধরেছেন উপন্যাসের শুরুতে –"গুড়িটা গাছের গোড়া নয়, নাকি দ্রাবিড় ভাষার শব্দ, ঠিক কি মানে ছিল তা ধরা যাচ্ছে না, তবে গুড়িযুক্ত গ্রামের নামগুলো নাকি প্রমাণ করেছে, এদিকে বোড়ো জাতের মানুষেরা ছিল। এমনকি এখন যাকে ভোটান বলা হয় সেখানেও বোড়োরা রাজত্ব করেছে। এসব নিয়ে বেশিদূর যাওয়া ভালো হয় না। অহোম-আসাম নিয়ে গোলমাল আছে। এরকম মত আছে, যারা নিজেদের অহোম বলছে, তারা ব্রহ্মপুত্রের দুপারে বড় বড় ঘাসের পৃথিবীতে পৌঁছানোর আগেই, আরও একদল মানুষ সে সব জায়গাকে আসাম, হা-সাম বলত। তাদের ভাষায় হা-সাম মানে পৃথিবী, মাটি, ভূমি-তৃণ, তৃণাচ্ছন্ন', এক কোথায় সবুজ তৃণাচ্ছন্ন পৃথিবী। যাক সে কথা, কোথায় গেলো তারা? রাভা নাকি তারা?"[১৬] এই প্রশ্নের মধ্যে দিয়ে রাভা জনজাতির অস্তিত্বের সংকটকে তিনি ঘনীভূত করে তুলেছেন। তাদের সমাজ-সংস্কৃতি সময়ের কিভাবে হারিয়ে যাচ্ছে তা তিনি দেখিয়েছেন এই উপন্যাসে। লুপ্তপ্রায় জনজাতির মানুষদের কথা আলোচ্য উপন্যাসের তুলে ধরেছেন লেখক।

অমিয়ভূষণ *বিনদনি* উপন্যাসে বুদিনাথ দাসের সংলাপের মধ্যে দিয়ে দেখিয়েছেন রাভা-কোচরা কীভাবে হিন্দুর সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। বুদিনাথ রাভা জনজাতি সর্ম্পকে জানায় – তারা 'নাং কোচা। আমরা কোচ' তারা রাভা এবং কোচ দুটোই। উত্তরবঙ্গে বহুদিন ধরে কোচ রাজারা রাজত্ব করেছিল। তারাই রাভা-কোচদের সর্বনাশ করেছে। বুদিনাথের সংলাপের মধ্যে দিয়ে লেখক এই প্রসঙ্গটি তুলে ধরেছেন। লেখক দেখিয়েছেন কীভাবে বিভিন্ন দলের রাজনৈতিক নেতারা নিজেদের প্রয়োজনে উপজাতিদের ব্যবহার করেছে, উপন্যাসে লেখক তা স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন – "তুই জানিস? উম্রা নাকি কয় রিস্টোবেঙ্গল এলা দশ হাজার আর হামরা পাঁচ হাজার। গাদলু একটু ভেবে নিল। বলল কথাটা মিথ্যা নয়। ও তো বলে, এখন প্রধানরা যে মাটি কাটায় কাজ করায়, তাতেও ওদের সংখ্যা বেশি বেশি, খেতমজুরের বেলাতেও তাই। সংখ্যায় ওরা আরও বেড়ে যেতে পারে। খোঁজ করলে দেখবি, রাভাদের জমিতে ওরা অনেকে আধিয়ার হয়ে গিয়েছে। জনাদল বলল, বমভোলা কয়, মন্ত্রী নাকি বলছে ইম্রা আত্মীয়। আইসবেই এটে। যারা দ্যাশ ভাগ করছে উম্রায় দায়ী। ইম্রায় চিরদিন আত্মীয় থাকিবে।"[১৭]

অমিয়ভূষণ মজুমদার তাঁর *বিনদনি* এবং *মাকচক হরিণ* উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে রাভা জনজাতির বাড়িঘরের বর্ণনা দিয়েছেন। এই উপন্যাস দুটি থেকে আমরা জানতে পারি রাভা সমাজের

মানুষেরা নিজেদের থাকার ঘর নিজেরাই তৈরী করত। বাড়ি তৈরী করার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ তারা বন-জঙ্গল থেকে সংগ্রহ করত। প্রতিটি রাভা পরিবারে কাঠ দিয়ে তৈরি একটি বড়ো ঘর থাকত। এই বড়ো ঘরকে তারা চার-পাঁচটি ভাগে ভাগ করে নিত নিজেদের প্রয়োজনে। যে সব রাভা পরিবারে আর্থিক অবস্থা ভালো ছিল তারা পাটাতন করা দুটি ঘর বানাত। তাদের ভাষায় সেই ঘরকে বলা হয় নক্সা নগৌ। কিন্তু পরবর্তী সময়ে তাদের বাড়িঘরের অনেক পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। *মাকচক হরিণ* উপন্যাসে লেখক উত্তরবঙ্গের রাভা পরিবারের বাড়িঘরের নিম্নরূপ বর্ণনা দিয়েছে –"বাড়িটায় এখনও পুরু খড়ের ছাদ। দোতলা বারান্দা-সমেত কাঠের, কিন্তু রঙ করা, আর একতলা লাল সিরমেন্টের। আগৎ বোধ হয় এক তলাটাও কাঠের ছিল। সেই বাড়ির সামনে মোটা শাঁলখোটার পর শোয়ানো আর এক শাঁলখোটার গ্যাট্। বাঁয়ের শাঁলখোটার গায়ে সাদা টিনের পাতে নিল অক্ষরে লেখা 'নাইগৌ।"[১৮]

বিনদনি উপন্যাসে লেখক রাভা সমাজের পোশাক-পরিচ্ছেদ এবং অলংকারের বর্ণনা দিয়েছেন। রাভা সমাজের মানুষেরা ছিল নৃত্যগীত প্রিয়। সারা বছরই তাদের বিভিন্ন উৎসব লেগে থাকত। আর এই উৎসবের জন্য প্রয়োজন হত বিভিন্ন ধরনের পোশাক-পরিচ্ছেদ এবং অলংকারের। তাঁত শিল্পের কাজ ছিল রাভা নারীদের জানা তাই তাদের প্রয়োজনীয় পোশাক নারীরা নিজেরাই তৈরি করত। *বিনদনি* উপন্যাসে লেখক নিম্নরূপ পোশাক পরিচ্ছেদের বর্ণনা দিয়েছেন –"হতে পারে, কেউ একদিন ফ্রক ছেড়ে আসামের দোখনার মত লাইফুন পরেছিল যা পায়ের পাতা ছুঁয়ে যায়, হতে পারে তাঁর বুক ঢাকার কামুং মেখলার মত পরা ছিল। সে সব প্রমাণ করে, সে সবই মাপে বড় হচ্ছিল সেই হাল্কা বারো-তের বছরের সবুজ সবুজ গায়ে। বিন্দে, তোর সাত নহর-লবগ আর আধুলি গাঁথা মালা তোর একমুঠো কোমরে আর কুল-বড়োই সমান বুকে বড় হচ্ছিল।"[১৯]

আলোচ্য উপন্যাসগুলির মধ্যে দিয়ে অমিয়ভূষণ মজুমদার উত্তরবঙ্গের রাভা জনজাতির ইতিহাস এবং তাদের সমাজ-সংস্কৃতির পরিচয় তুলে ধরে তাদের বিপন্ন অস্তিত্বের কাহিনিরই ইঙ্গিত দিয়েছেন। নিম্নবর্গ মানুষের জীবন বর্ণনাকে ঔপন্যাসিক এমন বিশ্বাসযোগ্য করে তুলেছেন যে তাদের চাহিদা, বেঁচে থাকার লড়াই, জমির দাবি, ক্ষুধার দাবি সমস্তই আজও যেন প্রাসঙ্গিক। এই উপন্যাসগুলি যেন রাভা জনজাতির জীবন্ত দলিল। আর এই উপন্যাসগুলির মধ্যে দিয়ে রাভা জনজাতির অস্তিত্বের সংকটের কথা স্পষ্টভাবে উঠে এসেছে।

উপসংহার

অমিয়ভূষণ মজুমদার তাঁর কথাসাহিত্যের মধ্যে দিয়ে রাভা জনজাতির অস্তিত্বের সংকটকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন এবং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাদের সংস্কৃতি কিভাবে হারিয়ে যাচ্ছে তা দেখানোই ছিল তাঁর মূল অভিপ্রায়। আসলে তিনি দেখাতে চেয়েছেন উত্তরবঙ্গে রাভা জনজাতি সবচেয়ে বেশি ভুক্তভোগীদের অন্যতম। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তারা বসতি হারিয়েছে, সংস্কৃতি হারিয়েছে, ভাষা হারিয়েছে, অস্তিত্ব হারিয়েছে। হারিয়েছে মানবিক সম্পর্কের বিন্যাসও। আমরা জানি যে, নিয়ত পরিবর্তনশীল এই পৃথিবীতে কোনো কিছুই চিরস্থায়ী নয়। তবুও আমরা এই সত্যকে সহজে গ্রহণ করতে পারি না। তেমনি রাভা জনজাতিরাও পারেনি। রাভাদের জীবনেও পরিবর্তন আসে। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই জনগোষ্ঠীর জীবনেও সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটতে থাকে। আধুনিকরণের এই প্রক্রিয়ার প্রথম ধাপ ছিল রাভাদের ধর্মান্তরীকরণ প্রক্রিয়া। কিন্তু ধর্মান্তরিত হওয়ার ফলে রাভাদের কী ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় সে কথা বিস্তারিতভাবে না হলেও তাঁর কথাসাহিত্যে এসেছে। লেখক সবদিক থেকে এই জনজাতিকে প্রত্যক্ষ করেছেন এবং তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আলোচ্য উপন্যাসগুলিতে ব্যক্ত করেছেন।

তথ্যসূত্র

১. মজুমদার, অমিয়ভূষণ (২০১০)। *মাকচক হরিণ । অমিয়ভূষণ রচনাসমগ্র*। অষ্টম খণ্ড। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং। পৃ. ২৪৩।

২. ফুয়াদ, আফিফ (সম্পাদিত) (২০০১)। *দিবারাত্রির কাব্য, অমিয়ভূষণ মজুমদার সংখ্যা*। নবম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, কলকাতা। পৃ. ২৬৬।

৩. ফুয়াদ, আফিফ (সম্পাদিত) (২০০১)। *দিবারাত্রির কাব্য, অমিয়ভূষণ মজুমদার সংখ্যা*। নবম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, কলকাতা। পৃ. ২৮১।

৪. মজুমদার, অমিয়ভূষণ (২০১০)। *মাকচক হরিণ । অমিয়ভূষণ রচনাসমগ্র*। অষ্টম খণ্ড। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং। পৃ. ২৯৪।

৫. মজুমদার, অমিয়ভূষণ (২০১০)। *মাকচক হরিণ । অমিয়ভূষণ রচনাসমগ্র*। অষ্টম খণ্ড। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং। পৃ. ২৫৩।

৬. মজুমদার, অমিয়ভূষণ (২০১০)। *মাকচক হরিণ* । *অমিয়ভূষণ রচনাসমগ্র*। অষ্টম খণ্ড। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং। পৃ. ২৫১।

৭. মজুমদার, অমিয়ভূষণ (২০১০)। *মাকচক হরিণ* । *অমিয়ভূষণ রচনাসমগ্র*। অষ্টম খণ্ড। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং। পৃ. ২৫৩-২৫৪।

৮. ভট্টাচার্য, উৎপল (সম্পাদিত) (২০১৬)। *সাক্ষাৎ অমিয়ভূষণ, অমিয়ভূষণ মজুমদারের সাক্ষাৎকারের নির্বাচিত সংকলন* । কলকাতা: কবিতীর্থ। পৃ. ৯৪।

৯. মজুমদার, অমিয়ভূষণ (২০১০)। *মাকচক হরিণ* । *অমিয়ভূষণ রচনাসমগ্র*। অষ্টম খণ্ড। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং। পৃ. ২৫৫।

১০. মজুমদার, অমিয়ভূষণ (২০১০)। *মাকচক হরিণ* । *অমিয়ভূষণ রচনাসমগ্র*। অষ্টম খণ্ড। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং। পৃ. ২৯৩।

১১. সামন্ত, সুবল (সম্পাদিত) (২০১৮)। *অমিয়ভূষণ মজুমদার*। বিশেষসংখ্যা। কলকাতা: এবং মুশায়েরা। পৃ. ১৯৬।

১২. মজুমদার, অমিয়ভূষণ (২০১০)। *সোঁদাল* । *অমিয়ভূষণ রচনাসমগ্র*। অষ্টম খণ্ড। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং। পৃ. ৮৩।

১৩. মজুমদার, অমিয়ভূষণ (২০১০)। *সোঁদাল* । *অমিয়ভূষণ রচনাসমগ্র*। অষ্টম খণ্ড। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং। পৃ. ৮২।

১৪. মজুমদার, অমিয়ভূষণ (২০১০)। *সোঁদাল* । *অমিয়ভূষণ রচনাসমগ্র*। অষ্টম খণ্ড। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং। পৃ. ৮১।

১৫. সামন্ত, সুবল (সম্পাদিত) (২০১৮)। *অমিয়ভূষণ মজুমদার*। বিশেষসংখ্যা। কলকাতা: এবং মুশায়েরা। পৃ. ১৮৯।

১৬. মজুমদার, অমিয়ভূষণ (২০০৯)। *বিনদিনি* । *অমিয়ভূষণ রচনাসমগ্র*। সপ্তম খণ্ড। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং। পৃ. ৮৫।

১৭. মজুমদার, অমিয়ভূষণ (২০০৯)। *বিনদিনি* । *অমিয়ভূষণ রচনাসমগ্র*। সপ্তম খণ্ড। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং। পৃ. ১৩২।

১৮. মজুমদার, অমিয়ভূষণ (২০১০)। *মাকচক হরিণ* । *অমিয়ভূষণ রচনাসমগ্র*। অষ্টম খণ্ড। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং। পৃ. ২৭৪।

১৯. মজুমদার, অমিয়ভূষণ (২০০৯)। *বিনদিনি* । *অমিয়ভূষণ রচনাসমগ্র*। সপ্তম খণ্ড। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং। পৃ. ১০৬-১০৭।

ক্ষেত্রসমীক্ষায় সংগৃহীত প্রাসঙ্গিক ছবি সমূহ

চিত্র ১

চিত্র ২

চিত্র ৩

চিত্র ৪

চিত্র ৫

চিত্র ৬

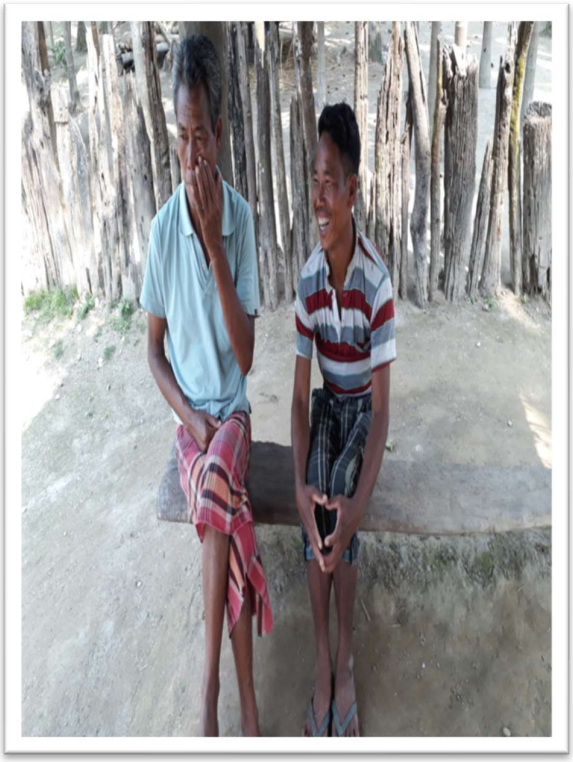

চিত্র ৭

চিত্র ৮

চিত্র ৯

চিত্র ১০

চিত্র ১১

চিত্র ১২

চিত্র ১৩

চিত্র ১৪

চিত্র ১৫

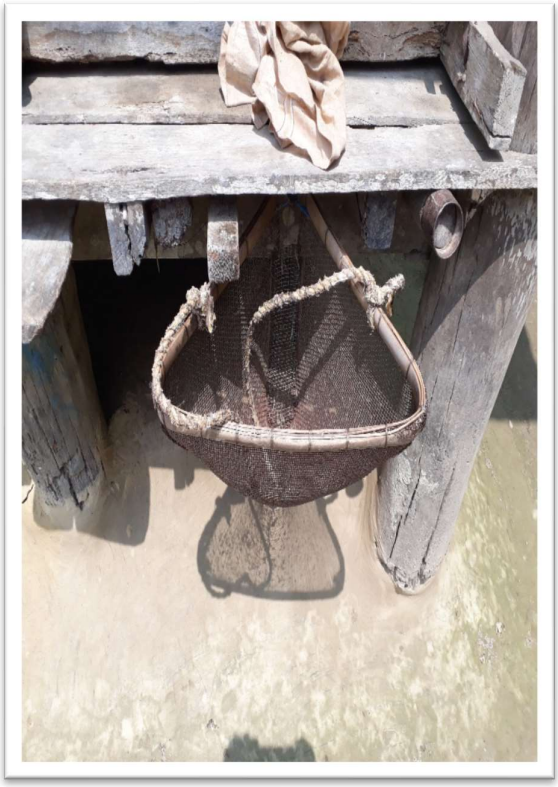

চিত্র ১৬

চিত্র ১৭

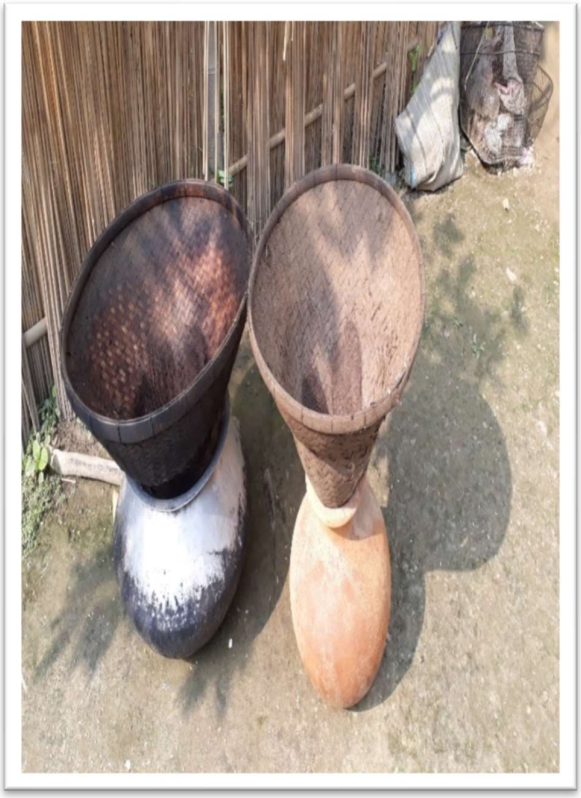

চিত্র ১৮

চিত্র ১৯

চিত্র ২০

চিত্র ২১

চিত্র ২২

চিত্র ২৩

চিত্র ২৪

চিত্র পরিচয়

১. বিনতা রাভা (মহিলা, বয়স: ৩৪, গ্রাম: বড়বস্তি, গ্রাম পঞ্চায়েত অঞ্চল: শালকুমার ২, জেলা: আলিপুরদুয়ার)।

২. ললিতা রাভা (মহিলা, বয়স: ৪৮, গ্রাম: মুন্সী পাড়া, গ্রাম পঞ্চায়েত অঞ্চল: শালকুমার ১, জেলা: আলিপুরদুয়ার)।

৩. কান্দুরি রাভা (মহিলা, বয়স: ৫২, গ্রাম: বড়বস্তি, গ্রাম পঞ্চায়েত অঞ্চল: শালকুমার ২, জেলা: আলিপুরদুয়ার)

৪. সমারি রাভা (মহিলা, বয়স: ৫৩, গ্রাম: ছোটবস্তি, গ্রাম পঞ্চায়েত অঞ্চল: শালকুমার ২, জেলা: আলিপুরদুয়ার)।

৫. বিষ্ণু রাভা (পুরুষ, বয়স: ৫২, গ্রাম: ছোটবস্তি, গ্রাম পঞ্চায়েত অঞ্চল: শালকুমার ২, জেলা: আলিপুরদুয়ার)।

৬. রাজেন রাভা (পুরুষ, বয়স: ৪১, গ্রাম: মুন্সি পাড়া, গ্রাম পঞ্চায়েত অঞ্চল: শালকুমার ১, জেলা: আলিপুরদুয়ার)।

৭. ভবেশ রাভা ও নির্মল রাভা (পুরুষ, বয়স: ৫১ ও ৩৩, গ্রাম: সুরিপাড়া, গ্রাম পঞ্চায়েত অঞ্চল: শালকুমার ২, জেলা: আলিপুরদুয়ার)।

৮. সাবিত্রী রাভা (মহিলা, বয়স: ৩২, গ্রাম: মুন্সি পাড়া, গ্রাম পঞ্চায়েত অঞ্চল: শালকুমার-১, জেলা: আলিপুরদুয়ার)।

৯. গীতা রাভা (মহিলা, বয়স: ৪৮, গ্রাম: ছোটবস্তি, গ্রাম পঞ্চায়েত অঞ্চল: শালকুমার ২, জেলা: আলিপুরদুয়ার)।

১০. কুমুদিনী রাভা (মহিলা, বয়স: ৪৮, গ্রাম: ছোটবস্তি, গ্রাম পঞ্চায়েত অঞ্চল: শালকুমার ২, জেলা: আলিপুরদুয়ার)।

১১. বিরেন রাভা (পুরুষ, বয়স: ৬৬, গ্রাম: বড়বস্তি, গ্রাম পঞ্চায়েত অঞ্চল: ২ শালকুমারহাট জেলা: আলিপুরদুয়ার)।

১২. সনেকা রাভা, (মহিলা, বয়স: ৫৪, গ্রাম: ছোটবস্তি, গ্রাম পঞ্চায়েত অঞ্চল: শালকুমার ২, জেলা: আলিপুরদুয়ার)।

১৩. যোগেশ রাভা (পুরুষ, বয়স: ২২, গ্রাম: ছোটবস্তি, গ্রাম পঞ্চায়েত অঞ্চল: শালকুমার ২, জেলা: আলিপুরদুয়ার)।

১৪. প্রতিমা রাভা (মহিলা, বয়স: ৪৬, গ্রাম: ছোটবস্তি, গ্রাম পঞ্চায়েত অঞ্চল: শালকুমার ২, জেলা: আলিপুরদুয়ার)।

১৫. রাভা সমাজের মাছ ধরার বাঁশের তৈরি যন্ত্র।

১৬. রাভা সমাজের মাছ ধরার বাঁশের জালের তৈরি যন্ত্র।

১৭. রাভা সমাজের মাছ ধরার বাঁশের তৈরি যন্ত্র।

১৮. রাভা সমাজের চকৎ (মদ) তৈরির উপকরণ।

১৯. এই গাছের (বাখব) পাতা থেকে 'চকৎ' তৈরির ওষুধ বানানো হয়।

২০. শালকুমারহাট অঞ্চলের রাভা জনজাতির শাল কাঠের তৈরি ঘর।

২১. রামসিং রাভা (পুরুষ, বয়স: ৫৬, গ্রাম: মুন্সি পাড়া, গ্রাম পঞ্চায়েত অঞ্চল: শালকুমার ১, জেলা: আলিপুরদুয়ার)।

২২. কল্পনা রাভা (মহিলা, বয়স: ৫২, গ্রাম: বড়বস্তি, গ্রাম পঞ্চায়েত অঞ্চল: শালকুমার ২, জেলা: আলিপুরদুয়ার)।

২৩. লতিকা রাভা (মহিলা, বয়স: ৫৫, গ্রাম: বড়বস্তি, গ্রাম পঞ্চায়েত অঞ্চল: শালকুমার ২, জেলা: আলিপুরদুয়ার)।

২৪. মাটি দিয়ে তৈরি বাস্তু দেবীর পূজার স্থান।

উপসংহার

আলিপুরদুয়ার জেলার শালকুমারহাট অঞ্চলের ‘রাভা’ জনজাতির মানুষের উপর ক্ষেত্রসমীক্ষা করতে গিয়ে যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করি তা আমার আলোচ্য গবেষণাপত্রে উল্লেখ করার চেষ্টা করেছি। ক্ষেত্রসমীক্ষায় উঠে এসেছে সেখানকার মানুষের সময়ের সাথে দিন বদলের দিন যাপনের পালা। সময়ের আধুনিকতায় পুরাতন নিয়ম-রীতি, আচার-অনুষ্ঠান, লোকসংস্কার-লোকবিশ্বাস মানুষের মন থেকে অনেকটাই মুছে গেছে। তবে সমাজের কিছু বয়স্ক মানুষ পুরাতন সংস্কারে বিশ্বাস করলেও বর্তমান রাভা সমাজের বেশিরভাগ মানুষই পুরাতন নিয়ম-রীতি থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছে। শালকুমারহাট অঞ্চলের মানুষের সঙ্গে কথোপকথনে উঠে এসেছে অনেক হিন্দু রাভা থেকে ধর্মান্তরিত হয়ে খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করছে। ধর্মান্তরিত হওয়ায় তাদের সংস্কৃতি, সামাজিক অবস্থানে অনেক বৈসাদৃশ্য দেখা দিয়েছে। শুধুমাত্র ধর্মান্তরিত হওয়ার কারনেই তাদের সংস্কৃতির বদল ঘটেছে এমনটা নয়।

শালকুমার-১, শালকুমার-২, অঞ্চলের অধিকাংশ মানুষ রাজবংশী সম্প্রদায়ের। রাভা পরিবারগুলির দিনের বেশির ভাগ রাজবংশীদের সঙ্গে সময় কাটে। ফলে রাজবংশী মানুষের সাথে রাভা জনজাতির মানুষের একটা নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। রাভা পরিবারগুলি সময়ের সাথে নিজেদের সংস্কার, আচার, অনুষ্ঠান, সামাজিক রীতি-নীতি গুলি ভুলে রাজবংশী সংস্কৃতিকে গ্রহণ করছে। বর্তমানে এই অঞ্চলের রাভা পরিবারগুলি রাজবংশী ভাষাকে নিজের ভাষা হিসেবে গ্রহণ করেছে। গবেষণাপত্রের প্রস্তাবিত প্রথম অধ্যায়ে আলিপুরদুয়ার জেলার রাভা বসতি গ্রামগুলিতে রাভা জনসংখ্যা সময়ে সঙ্গে সঙ্গে কমে যাচ্ছে এই বিষয়টি স্পষ্ট ভাবে উঠে এসেছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে রাভা জনজাতির মানুষেরা উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে কখন কিভাবে কোথা এলো এবং পরবর্তীতে সময়ে তাদের বাসস্থান, ঘরবাড়ি, আসবাসপত্র, পোষাক-পরিচ্ছেদের যে পরিবর্তন দেখা দিল সেই বিষয়গুলো আলোচিত হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে রাভা জনজাতির লুপ্তপ্রায় সংস্কৃতিগুলি আলোচনা করা হয়েছে। যেমন সামাজিক ট্যাবু, জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ, গর্ভবতী মহিলাদের হারিয়ে যাওয়া লোকসংস্কার, শিশুর নামকরণ, লুপ্তপ্রায় মৃতদেহ সৎকার ও শ্রাদ্ধের নিয়মাবলী, ভিন্ন ভিন্ন পার্বণের সামাজিক রীতি-নীতি, লোকনৃত্য, লোকগীতগুলি সময়ের সঙ্গে কিভাবে হারিয়ে গেলো তার বিশদ বিবরণ পাব। চতুর্থ অধ্যায়ে অমিয়ভূষণ মজুমদারের আলোচ্য উপন্যাস বিশ্লেষণ করে রাভা জনজাতির অস্তিত্বের সংকটের কথা আলোচিত হয়েছে।

ক্ষেত্রসমীক্ষায় লক্ষ করেছি বয়স্ক মানুষ জনের মধ্যে প্রাচীন রীতি-নীতি মেনে চলার একটা প্রবণতা থাকলেও তরুণদের মনে সেই সব রীতিনীতি নিয়ে কোন ধ্যান ধারণা নেই। আমি পূর্বে উল্লেখ করেছি শালকুমারহাট অঞ্চলে বসবাসকারী রাভা জনজাতির মানুষ, অসম, মেঘালয়, থেকে এসে এই অঞ্চলে বসবাস করছে। জলদাপাড়া অভয়ারণ্যের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলকে তারা বাসযোগ্য করে গড়ে তুলেছে। কিন্তু এইসব অঞ্চলগুলিতে একসময় বসবাস করা খুবই কঠিন ছিল। এই অঞ্চলে শীত খুব দীর্ঘস্থায়ী। তাই শীত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বনে-জঙ্গলে আগুন লাগিয়ে তাপ পোয়াতেন। প্রথম দিকে বেঁচে থাকার জন্য বনাঞ্চল থেকে কাঠ, ফল, মধু, সংগ্রহ করত। জীবজন্তুর সাথে প্রতিনিয়তই চলত লড়াই। পিতৃ-পুরুষের তেমন কোনো সম্পত্তি না থাকায় এই অঞ্চলের রাভা সম্প্রদায়ের মানুষদের দরিদ্রতার সঙ্গে জীবন-যাপন করতে হত। দুই-চারটে শিক্ষিত পরিবার ছাড়া অধিকাংশ রাভা পরিবার দরিদ্র সীমার নিচে বাস করে। রাভা সমাজের পুরুষেরা অলস এবং কর্মবিমুখ, তারা মোট আয়ের বেশির ভাগই একসময় চকোৎ পানে ব্যয় করত। কিন্তু এখন প্রশাসনের সহযোগিতায় চকোৎ তৈরি বন্ধ হয়েছে। বিভিন্ন সরকারি এবং বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবক সংগঠনের উদ্যোগে রাভা সমাজকে মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা হচ্ছে। ফলে পুরাতন রীতি-নীতি থেকে বেরিয়ে এসে রাভা সমাজ-সংস্কৃতির অনেকটা পরিবর্তন দেখা দিয়েছে।

সভ্যতার অগ্রগতি যতদিন ঘটবে মানুষের চাহিদার কাছে প্রয়োজনহীন বিষয়গুলি ক্রমশই হারিয়ে যাবে। আবার সেই সূত্র ধরেই সৃষ্টি হবে লোকসংস্কৃতির নতুন নতুন বিষয়। লোকসংস্কৃতি চলমান-বহমানতাই তার বৈশিষ্ট্য। কিন্তু তথাকথিত সভ্য সমাজের কাছে আদিবাসী অনগ্রসর জাতি হিসেবে প্রাচীনকাল থেকে আজও পরিচিত। কিন্তু আমরা ভুলে যাই আমাদের নৈতিক দায়িত্বটুকুও, ন্যূনতম সহযোগিতা না করে তাদের প্রাপ্য অধিকারটুকুও কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করি। রাভা জাতিদের সম্পর্কে আমার গবেষণা সন্দর্ভের এই অনুসন্ধান যে খণ্ডিত তা বলার অপেক্ষা রাখে না। অল্প পরিসরে সে সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করার ক্ষেত্র এটি নয়। তার জন্য প্রভূত পরিশ্রম ও ক্ষেত্রসমীক্ষা প্রয়োজন। আমি সীমিত ক্ষেত্রসমীক্ষার সাহায্যে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে রাভা জাতিদের বর্তমান সংস্কৃতি সম্পর্কে কিছু ধারণা লাভ করতে পেরেছি। এই জাতির নিজস্ব সংস্কৃতি বিলুপ্তির দিকে চলেছে। কিন্তু এর বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য তাদের যেমন সচেতনতা প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন নাগরিক রুচিশীল মানুষের সহমর্মিতা। এই সম্পর্কে সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাপক অনুসন্ধান হওয়া প্রয়োজন। কেবল রাভা জাতিরাই যে এই সঙ্কটের মধ্যে রয়েছে

তা নয়, এটা অন্যান্য প্রান্তিক জাতির ক্ষেত্রেও সত্য। ভবিষ্যতে এই সম্পর্কে বিস্তৃত অনুসন্ধান ও গবেষণা করার সুযোগ পেলে বিষয়টির উপর আরো আলোকপাত করা সম্ভব হবে।

পরিশিষ্ট

ক্ষেত্রসমীক্ষায় রাভা সম্প্রদায়ের মানুষের সঙ্গে কথোপকথন

সাক্ষাৎকার: ১

ভবেশ রাভা

(পুরুষ, বয়স: ৫১, গ্রাম: সুরিপাড়া, গ্রাম পঞ্চায়েত অঞ্চল: শালকুমার ২, জেলা: আলিপুরদুয়ার)

প্র: দাদা আপনার নাম কি?

উ: ভবেশ রাভা।

প্র: আপনার বয়স কত?

উ: একান্ন বছর।

প্র: এই গ্রামের নাম কি?

উ: সুরিপাড়া।

প্র: এই গ্রামে আপনারা কত পরিবার আছেন?

উ: পঞ্চাশ-ষাট ঘর হবে মনে হয়।

প্র: মোট কত জন লোক বাস করেন?

উ: প্রতি ঘরে পাঁচ ছয় জন করে। প্রায় তিনশো জনের মতো হবে।

প্র: এই পাড়ায় পুরুষ মহিলার সংখা কত?

উ: এই পাড়ায় পুরুষের চেয়ে মহিলার সংখ্যা বেশি।

প্র: আপনার পরিবারের কত জন সদস্য?

উ: আমার পরিবারে পাঁচ জন। দুই ছেলে, এক মেয়ে, স্ত্রী।

প্র: আপনার ছেলে, মেয়ের লেখা পড়া কতদূর?

উ: বড়ো ছেলে ক্লাস নাইন পর্যন্ত, ছোট ছেলে ক্লাস সেভেন, মেয়ে ক্লাস সিক্স।

প্র: আপনার ছেলেরা এখন কি করেন?

উ: বড়ো ছেলে জয়গাঁও তে গ্যারেজের কাজ করে। ছোট ছেলে রাজমিস্ত্রির কাজ করে।

প্র: আপনার মেয়ের বয়স কত হবে?

উ: ওই ধরেন বিশ-বাইশ হবে। বিয়ে দিয়েছি গত বছর।

প্র: মেয়ের বিয়ে কোথায় দিয়েছেন?

উ: পাশের গ্রামে ছোট রাভা বস্তি।

প্র: আপনার জামাই কি করেন?

উ: জামাই কেরলে রাজমিস্ত্রির কাজ করেন।

প্র: আপনার সমাজে কি বিয়েতে যৌতুক দেওয়ার রীতি আছে?

উ: আগে ছেলের বাড়ি থেকে মেয়ের বাড়িতে যৌতুক দেওয়া রীতি ছিল। এখন ছেলের বাড়িতেই যৌতুক দিতে হয়।

প্র: আপনার বিয়ের সময় আপনাকে কি যৌতুক দিতে হয়ে ছিল?

উ: সেই সময়তো যৌতুক না দিতে পারলে বিয়েই হত না। আমার বাবার যৌতুক দেওয়ার মত তেমন আর্থিক অবস্থা ছিল না, তাই বিয়ের আগে আমাকে শ্বশুর বাড়িতে দু-বছর কাজ করে দিতে হয়েছিল। দুই বছর হয়ে গেলে দুই পরিবারের সম্বন্ধে বিয়ে হয়।

প্র: আপনি যে বাড়িতে বাস করছেন তা কি আপনার নিজের সম্পত্তি?

উ: সরকারি খাস জমিতে বাড়ি করে আছি। এই বস্তিগুলিতে আমরা যারা আছি বেশির ভাগই খাস জমিতে বাড়ি। চাষ করার জন্যও তিন বিঘা জমি পেয়েছি।

প্র: খাস জমিতে বাড়ি করে আছেন কোন সমস্যায় পরতে হয় না আপনাদের?

উ: তেমন কোন সমস্যায় কোনো দিন পরিনি।

প্র: চাষ করার জন্য আপনারা কি সবাই জমি পেয়েছেন?

উ: হ্যাঁ প্রায় সবাই পেয়েছি।

প্র: যখন আপনাদের জমি ছিল না তখন কি করতেন?

উ: তখনতো সবাই মিলে ফরেস্টে কাঠ কাটতে যেতাম। গাছ কেটে লাকড়ি বানিয়ে বিক্রি করে কোন রকম সংসার চলত।

প্র: এখন আপনার পেশা কি?

উ: যখন যা পারি তাই করি। জমি আছে তিন বিঘা। জমিতে কাজ করি। জমিতে শুধু ধান চাষ হয়, অন্য ফসলতো তেমন হয় না। তাই মাঝে মধ্যে দিন-মজুরি করতে হয়।

প্র: কোথায় দিন-মজুরির কাজ করেন?

উ: পাশে চা বাগান আছে। কোনদিন চা-শ্রমিকের কাজ করি, কোনোদিন রাজমিস্ত্রি, যখন যা পাই।

প্র: কত টাকা করে মজুরি পান?

উ: আগে চা শ্রমিক হিসেবে ১৮০ টাকা করে দিত। এখন ২৪০ টাকা করে দেয়।

প্র: এই টাকা দিয়ে সংসার চলে?

উ: কোনরকম চলে যায়। দুই টাকা কেজির চাল পাই। তাই চাল বেশি বাইরে থেকে কিনতে হয় না।

প্র: এই গ্রামে পূজা হয়?

উ: হ্যাঁ। পূজাতো সারা বছর লেগেই থাকে।

প্র: কী কী পূজা হয়?

উ: কামাখ্যা পূজা, জোকাজুকিনি-, দেকাল, ঋষিজগ-, বুলুয়া বায়, নুর বায়, বাস্তু দেবী, গাংরাজা, হাসংবাই, দরমংরাই, আরও অনেক দেব দেবী পূজা হয় এই সুরিপাড়ায়।

প্র: আপনাদের বাড়িতে কি এই সব দেব দেবীর পূজা হয়?

উ: হ্যাঁ হয়। ছোট বেলায় দেখেছি আমার মা এই সব দেব-দেবীর পূজা করত। এখন আমার স্ত্রী করেন।

প্র: আপনারা কেন এসব দেব-দেবীর পূজা করেন?

উ: পরিবারের মঙ্গলের জন্য।

প্র: কোন কোন দেব দেবীর পূজা করলে পরিবারের মঙ্গল হয় বলে আপনারা মনে করেন?

উ: নুর বায়, গাংরাজা, ঋষিজগ-, হাসংবাই, দরমংরাই।

প্র: এই সব দেব দেবীর পূজা করলে আপনার পরিবারের কি কি মঙ্গল হয় বলে আপনি মনে করেন?

উ: নবজাত শিশু এবং প্রসূতির যেন সুস্থ থাকেন, কোন অপদেবতা, ভূত, পেত্নির কুনজরে না পরেন, তার জন্য গোটা রাভা সমাজ এই দেবীর পূজা করেন।

প্র: গাংরাজা, ঋষিজগ-, হাসংবাই, দরমংরাই এই সব দেব দেবীর পূজা কেন করেন?

উ: আমাদের সমাজে এটা বিশ্বাস যে গাংরাজার পূজার দিলে ধানচাষ ভালো হয়। আশ্বিন মাসের শেষ দিকে ধান চাষের জমিতে সূর্য ডোবার পর এই দেবীর পূজা দেওয়া হয়।

আমাদের সমাজে ছেলে বা মেয়ের বিয়ের আগে ঋষিজগ- দেবতার পূজা করার রীতি আছে। বিবাহিত দম্পতির যেন সুখে শান্তিতে বাস করতে পারে এই কামনায়, ঋষিজগ- দেবতার পূজা করা হয়।

আমাদের সমাজে বিশ্বাস যে কলেরা, আমাশয়, বসন্তের মত জটিল রোগে কেউ আক্রান্ত হলে তা থেকে নিরাময়ের জন্য দেবীর পূজা 'হাসংবাই' করা হয়।

'দরমংরাই' আমাদের সমাজে ধনের দেবী বলে পরিচিত। এই দেবীর পূজা করলে পরিবারে তেমন আর্থিক অভাব দেখা দেয় না।

প্র: আপনারা কোন কোন দেব দেবী কে অপদেবতা বলে মনে করেন?

উ: বুলুয়া বায়, দেকাল।

প্র: এই সব অপদেবতারা আপনাদের সমাজে কি প্রভাব ফেলে?

উঃ-'জোকাজুকিনি-' চার মাস থেকে আট দশ-মাসের শিশুদের উপর ভর করে।

বনে জঙ্গলে কাঠ কাটতে যাওয়ার সময় বুলুয়া বায় দেবতার পূজা দেওয়া হয়। কেউ পূজা না দিলে দেবতা ভর করে বসে।

মহিলাদের পেট ব্যাথা দেখা দিলে মনে করা হয় যে দেকাল অপদেবতা ভর করেছে।

সাক্ষাৎকার: ২

বিনতা রাভা

(মহিলা, বয়স: ৩৪, গ্রাম: বড়বস্তি, গ্রাম পঞ্চায়েত অঞ্চল: শালকুমার ২, জেলা: আলিপুরদুয়ার)

প্র: কি নাম তোমার?

উ: বিনতা।

প্র: পদবি কি তোমার?

উ: রাভা।

প্র: তোমাদের এই গ্রামের নাম কি?

উ: বড় রাভা বস্তি।

প্র: তোমার বাড়ি কি এই গ্রামেই ছিল?

উ: না।

প্র: কোথায় ছিল তোমার বাড়ি?

উ: কামাখ্যাগুড়ি।

প্রঃ কামাখ্যাগুড়িতে কত ঘর রাভা পরিবার আছে আছে?

উ: তিরিশ-পঁয়ত্রিশ ঘর হবে।

প্র: তোমার বাবা, মা কি দুজনের রাভা সম্প্রদায়ের?

উ: হ্যাঁ।

প্র: তোমার বাবা, মা কত বছর ধরে কামাখ্যাগুড়ি আছে?

উ: আমার জন্মের আগে থেকেই। আমার সব আত্মীয়-স্বজন কামাখ্যাগুড়িতেই থাকে।

প্র: এই গ্রামে বিয়ে হওয়ার কতদিন হল?

উ: প্রায় পাঁচ বছর হবে।

প্র: বিয়ের সম্বন্ধ কিভাবে হল?

উ: এই গ্রামেই আমার মাসির বাড়ি। মাসিই সম্বন্ধ ঠিক করে। দুই বাড়ির আলোচনায় বিয়ে হয়।

প্র: বিয়ের আগে এই গ্রামে এসেছিলে?

উ: হ্যাঁ। পাঁচ-ছয় বার আসা হয়েছে।

প্র: বিয়ের আগে কি তোমার স্বামীর সাথে পরিচয় ছিল?

উ: হ্যাঁ। মাসির বাড়ি আসার সূত্রেই চেনা জানা ছিল।

প্র: তোমার স্বামীর নাম কি?

উ: নৃপেন রাভা।

প্র: তোমার ছেলে মেয়ে কয় জন?

উ: এক ছেলে এক মেয়ে।

প্র: তোমার স্বামীর জীবিকা কি?

উ: ট্রাক্টর চালায়। জমি আছে কিছু, জমিতে চাষবাস করে।

প্র: তোমার স্বামীর বয়স কত?

উ: চল্লিশ বছর।

প্র: তোমার পড়াশুনা কতদূর?

উ: ক্লাস নাইন পর্যন্ত পড়েছি।

প্র: তোমার স্বামীর পড়াশুনা?

উ: মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছিল।

প্র: তোমার বিয়ের সময় কি যৌতুক দিতে হয়েছিলে?

উ: আমাদের বাড়ি থেকে কোন যৌতুক দিতে হয়নি। ছেলের বাড়ি থেকেই আমাদের বাড়িতে যৌতুক দিয়েছিল।

প্র: ছেলের বাড়ি থেকে তোমাদের বাড়িতে কি কি যৌতুক দিয়েছিল?

উ: আমাদের বাড়ির বিয়ের অনুষ্ঠানের যাবতীয় খরচ ছেলের বাড়ি থেকে দিয়েছিল।

প্র: তোমাদের সমাজে কন্যা শুল্ক প্রথা বা কন্যাপক্ষকে পন দেওয়ার রীতি কি এখনো আছে?

উ: আগে দেখেছি যে ছেলের বাড়ি থেকেই মেয়ের বাড়িতে পণ দেওয়া হত। আমার বিয়েতেও ছেলের বাড়ি থেকে পণ দিয়েছিল।

প্র: কোন ছেলে যদি পণ দিতে না পারত তাহলে কি তাঁর বিয়ে হত না?

উ: বিয়ে হত। তবে ছেলেকে শ্বশুর বাড়িতে ঘর-জামাই থাকতে হত। ছেলে যদি ঘর জামাই থাকতে রাজি না হত, তাহলে বিয়ের আগে ছেলেকে শ্বশুর বাড়িতে বিনাশ্রমে দুই বছর কাজ করে দিতে হত।

প্র: এখনও কি তোমাদের গ্রামে ঘর-জামাই থাকার রীতি আছে?

উ: হ্যাঁ আছে। আমাদের রাভা পরিবারে সবচেয়ে ছোট মেয়েই সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়। অনেকে সম্পত্তির লোভে ছোট মেয়েকে বিয়ে করে ঘর-জামাই থাকে।

প্র: শুধু ছোট মেয়ে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয় কেন?

উ: অনেক দিন ধরে আমাদের রাভা সমাজে রীতি আছে কোন পরিবারে যদি দুই, তিন জন কন্যা সন্তান থাকে তাহলে কন্যার পিতা ছোট মেয়ের বিয়ে দিয়ে ঘরে জামাই নিয়ে আসে। ছোট মেয়ের নামে সমস্ত সম্পত্তি করে দেয়। মেজ, বড় মেয়েকে অন্য পরিবারে বিয়ে দেয়।

প্র: একজন পুরুষ কি দু-তিনটে বিয়ে করতে পারত?

উ: আগে তো একজন পুরুষ দু-তিনটা করত। এখন আর দেখা যায় না।

প্র: তোমাদের কি একই গোত্রের মধ্যে বিয়ে হয়?

উ: একই গোত্রের মধ্যে রাভা সমাজে বিয়ে হয় না।

প্র: কেউ যদি একই গোত্রে বিয়ে করে তাহলে কি সমাজ তাকে মেনে নেয়?

উ: সমাজ মেনে নেয় না। সালিশি সভা বসিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। প্রায়শ্চিত্ত করলে সমাজ মেনে নেয়।

প্র: রাভা মহিলারা কি একের অধিক বিয়ে করতে পারত?

উ: এক সময় এমন বিয়ে প্রায়ই দেখা যেত। এক স্বামীর সাথে ঘর করার পর ভালো না লাগলে আবার অন্য কাউকে বিয়ে করত।

প্র: বিধবা মহিলা কি পুনরায় বিয়ে করতে পারে?

উ: হ্যাঁ পারে। আমাদের সমাজে এই নিয়ম আছে।

প্র: তোমাদের সমাজে কত বছর বয়সে ছেলে মেয়েদের বিয়ে হয়?

উঃ এক সময় নাবালিকা বিবাহের চল ছিল। এখন আঠারো-উনিশ বছর হলে ছেলে মেয়ের বিয়ে হয়।

প্র: ভাসুর বিবাহ কি নিষিদ্ধ?

উ: হ্যাঁ। রাভা সমাজে ভাসুর বিবাহ নিষিদ্ধ। কেউ যদি করে সমাজ থেকে তাকে বের করে দেওয়া হয়।

প্র: তোমাদের সমাজে কোন কোন মাস গুলিতে বেশি বিয়ে হয়?

উ: সামাজিক মতে বিয়ে হলে ফাগুন ও চৈত্র মাসেই বিয়ের দিন ঠিক করা হয়।

প্র: বছরের অন্যান্য মাসে বিবাহ হওয়ার রীতি কি নেই তোমাদের সমাজে?

উ: আগে তো এই দুই মাস ছাড়া অন্য মাসে বিয়ে হত না। গোটা রাভা সমাজ মনে করত ফাগুন ও চৈত্র মাসে বিয়ে হলে নবদম্পতির কোন অমঙ্গল হয় না। এখন আর আগের নিয়ম কেউ মানে না।

প্র: বিয়ের অনুষ্ঠান কি দুই বাড়িতেই হয়?

উ: হ্যাঁ।

প্র: বিয়ের দিন উপহার পাঠানোর রীতি আছে?

উ: হ্যাঁ। ছেলের বাড়ি থেকে মেয়ের বাড়িতে বিয়ের দিন দিনের বেলায় উপহার হিসেবে মোরগ, শূকরের মাংস, পান, সুপারি দিয়ে আসতে হয়। কন্যার পিতা কেও বিভিন্ন উপঢৌকন দিতে হয়।

প্র: বিবাহ অনুষ্ঠান কখন হয়?

উ: রাত্রি বেলায়।

প্র: কয়দিন ধরে বিয়ের অনুষ্ঠান হয়?

উ: ছেলের বাড়িতে দুই দিন, মেয়ের বাড়িতে একদিন।

প্র: তোমাদের সমাজে যিনি বিয়ে দেওয়ার দায়িত্বে থাকেন তাকে কি বলে?

উ: 'সারাঙ্গা' বলে।

প্র: তোমাদের সমাজে বিবাহ অনুষ্ঠানে কি কি রীতির দেখা যায়?

উ: সারাঙ্গা (পুরোহিত) বিয়ের দিন ঠিক করে। বিয়ের মণ্ডপের পাশে দুটো হাঁড়ি রাখতে হয় একটিতে চকৎ (মদ) এবং অন্যটিতে জল ভরে রাখতে হয়। 'সারাঙ্গা' হাঁড়ি দুটির পাশে ছেলে মেয়েকে দাঁড় করিয়ে রেখে ছেলের হাতের উপর কনের হাত রেখে তার ওপর ফুল ও দূর্বা, চকৎ ও চালের ছিটা দিয়ে, হাত দুটো কাপড় দিয়ে গিট বেঁধে দিতে হয়। বিয়ের দিন মেয়ের মাকে উপস থাকতে হয়।

প্র: মাতৃ বংশে কি বিয়ে হয়?

উ: না। মাতৃ বংশে বিয়ে করলে সমাজ মেনে নিবে না।

প্র: তোমাদের বিয়ের অনুষ্ঠানে মুরগির গলা কাটা হয় কেন?

উ: এটা আমাদের একটা প্রাচীন রীতি। বিয়ের কয়েকদিন পর মুরগির গলা কেটে উঠোনে ছেড়ে দেওয়া হয়। মুরগির ডান পা যদি বাঁ পায়ের থেকে বড় হয় তাহলে তাঁদের বিবাহিত জীবনে কোন সমস্যায় পরতে হয় না।

প্র: রাভা সমাজে স্ত্রীরা কি স্বামীকে নাম ধরে ডাকে?

উ: না।

প্র: বিয়ের কতদিন পর মেয়ের মা জামাইয়ের বাড়িতে আসতে পারে?

উ: বিয়ের প্রথম এক বছর মেয়ের মা জামাইয়ের বাড়িতে আসেন না। মেয়ে যখন গর্ভবতী হয় সেই সময় মেয়ের মা জামাইয়ের বাড়িতে আসেন।

সাক্ষাৎকার: ৩

বিষ্ণু রাভা

(পুরুষ, বয়স: ৫২, গ্রাম: ছোটবস্তি, গ্রাম পঞ্চায়েত অঞ্চল: শালকুমার ২, জেলা: আলিপুরদুয়ার)

প্র: দাদা আপনার নাম কি?

উ: বিষ্ণু রাভা।

প্র: আপনাদের এই গ্রামের নাম কি?

উ: ছোটবস্তি,।

প্র: আপনার বয়স কত?

উ: বাহান্ন বছর।

প্র: আপনি এই গ্রামে কত বছর ধরে আছেন?

উ: অনেক দিন ধরেই।

প্র: আপনার জন্ম কি এই গ্রামেই?

উ: হ্যাঁ।

প্র: আপনার বাবা মা কি জন্ম সূত্রে এই গ্রামের?

উ: আমার বাবার জন্ম কামাখ্যাগুড়িতে, মায়ের জন্ম এই গ্রামে।

প্র: আপনার বাবা কি এই গ্রামে বিয়ে করেছেন?

উ: হ্যাঁ। বাবা এখানে ঘর জামাই ছিল।

প্র: আপনার বাবার পেশা কি ছিল?

উ: কৃষিকাজ করতো। মাঝে মধ্যে দিন মজুরি।

প্র: আপনাদের জমি কত বিঘা?

উ: পাঁচ-ছয় বিঘা।

প্র: জমিতে কি কি শস্য চাষ হয়?

উ: এই গ্রামের জমিতে ধান চাষ হয়। অন্য চাষ ভালো হয় না।

প্র: আপনিও কি কৃষিকাজ করেন?

উ: না। আমি কারুশিল্পে পেশায় আছি।

প্র: কত বছর ধরে আপনি কারুশিল্পের সাথে আছেন?

উ: যখন পনেরো-ষোলো বছর বয়স তখন থেকেই এই কাজের সাথে যুক্ত।

প্র: কোথায় কাজ শিখেছেন?

উ: আমার দাদুর কাজ থেকে শিখেছি। তিনি খুব ভালো কাঠ ও বাঁশের কাজ জানতেন।

প্র: আপনার দাদুর কাজ থেকে আপনি কি কি কাজ শিখেছেন?

উ: মাছ ধরার সামগ্রী, নৌকা, বাদ্যযন্ত্র, বিভিন্ন পশুর মুখোশ তৈরি।

প্র: কারুশিল্পকে কেন পেশা করলেন?

উ: ছোট বেলায় দাদুর সাথেই বেশি সময় কাটাতাম। সেই সূত্রে এই শিল্পের সাথে পরিচয় হয়। তখন থেকেই নেশার টানে এই শিল্পের সাথে যুক্ত হই।

প্র: এই শিল্পের জন্য কি কি উপদান ব্যবহার করেন?

উ: বাঁশ, গামার, সেগুন কাঠ।

প্র: আপনি কি তৈরি করেন?

উ: দেবতার মূর্তি, মাছ ধরার যন্ত্র, বাড়ির সাজানো জিনিস, মুখোশ, বাদ্যযন্ত্র।

প্র: আপনাদের তৈরি কি কি জিনিস হারিয়ে যাচ্ছে বলে আপনি মনে করেন?

উ: যেমন-পলাও (জাখই), ডুকু (খলই), বিভিন্ন দেবতার বাদ্যযন্ত্র।

প্র: আপনারা কত জন এই কারুশিল্পের পেশায় আছেন?

উ: এই গ্রামে দু-চার জন আছি।

প্র: এসব কেমন বিক্রি হত? কোথায় বিক্রি করতেন?

উ: আগে তো খুব ভালো হত। আসামে খুবই চাহিদা ছিল এই শিল্পের। সারা বছর কাজ হত।

প্র: মুখোশের চাহিদা কেমন?

উ: আমাদের রাভা কারুশিল্পে মুখোশের চাহিদা সব থেকে বেশি।

প্র: কোন মুখোশের চাহিদা বেশি?

উ: লাউয়ের ডুগি দিয়ে তৈরি মুখোশ বেশি বিক্রি হত।

প্র: কোথায় বিক্রি করতেন মুখোশ গুলি?

উ: কলকাতায় নিয়ে যাই। সেখানেই এই মুখোশের চাহিদা বেশি।

প্র: কোনো প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেন না?

উ: রাজ্য সরকারের উদ্যোগে যেসব মেলা হয়। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রদর্শনীতে থাকি।

প্র: রাজ্যের বাইরে কোথাও প্রদর্শনীতে অংশ নিয়ে ছিলেন?

উ: হ্যাঁ। আসাম, ত্রিপুরাতে কয়েক বার যাওয়া হয়েছে। গুজরাট একবার তিন দিনের কর্ম শালা ছিল।

প্র: অন্য রাজ্য গুলিতে আপনাদের তৈরি কোন কারুশিল্পের চাহিদা বেশি?

উ: আসামে মূর্তির চাহিদা বেশি, ত্রিপুরাতে বাঁশের তৈরি শিল্প।

প্র: এখন কি আপনার পরিবারে কেউ এই শিল্পের সাথে যুক্ত আছে?

উ: হ্যাঁ। আমরা দুই ভাই এই শিল্পের সাথে আছি।

প্র: আপনারা কি বাড়িতেই এই সব শিল্প তৈরি করেন?

উ: বাড়িতেই করি। অন্য কেউ ডাকলে দিন মজুরি হিসেবে করি।

প্র: কারুশিল্পের কাজে দিন মজুরি কত টাকা করে?

উ: এখন তিনশো টাকা করে।

প্র: আপনার সংসার কি কারুশিল্পের আয়ের উপর চলে?

উ: এই কাজের সাথে সাথে কৃষিকাজও করা হয়।

প্র: আপনার কত বিঘা জমি আছে?

উ: বাবার ছয় বিঘা ছিল। আমরা দুই ভাই, তিন বিঘা করে আছে।

প্র: আপনার ভাইও কি কৃষিকাজ করেন?

উ: ধান চাষের সময় ধান করে। উচু জমিতে সব্জি চাষ করে।

প্র: আপনার সন্তান কয় জন?

উ: এক ছেলে, এক মেয়ে।

প্র: আপনার ছেলে কি আপনাকে এই কাজে সাহায্য করে?

উ: ছেলে পড়াশুনা করে। এই কাজে তাঁর আগ্রহ নেই।

প্র: কোথায় পড়াশুনা করে আপনার ছেলে?

উ: ইতিহাস নিয়ে আলিপুরদুয়ার বিবেকানন্দ কলেজে পড়ে।

প্র: আপনার মেয়ের আগ্রহ আছে এই শিল্পে?

উ: মেয়ের বিয়ে দিয়েছি। মেয়ের শ্বশুরবাড়িতে কারুশিল্পের কাজ হয়।

প্র: কোথায় বিয়ে দিয়েছেন?

উ: পাশের গ্রামে। ওর শ্বশুর আর আমি আগে এক সাথে কারু শিল্পের কাজ করতাম। সেই সূত্রে বিয়ে দিয়েছি।

প্র: আপনার জামাই কি এই শিল্পের সাথে যুক্ত?

উ: হ্যাঁ। জামাই কারুশিল্প কে পেশা করেছে। আসামে গিয়েও কারুশিল্পের কাজ করে।

প্র: আসামে কি কারুশিল্পের জনপ্রিয়তা বেশি?

উ: বর্তমানে আসামের জন্যই এই শিল্প টিকে আছে। ওখানে মাঝে মধ্যেই উৎসব লেগে থাকে। আসামের বিভিন্ন জনজাতির মানুষ আছে, তাঁদের উৎসব গুলিতে বিভিন্ন ধরনের মূর্তি, মুখোশ, বাদ্যযন্ত্রের প্রয়োজন হয়।

প্র: কি কি বাদ্যযন্ত্র তৈরি করেন?

উ: ঢোল, বংশী, কালবংশী, বাদাবেং, কালটেপ।

প্র: উত্তরবঙ্গের কারুশিল্পের বর্তমান অবস্থা কেমন?

উ: আমাদের উত্তরবঙ্গে এক সময় ভালোই ব্যবসা হত। কিন্ত এখন আর কেউ এ সব বাদ্যযন্ত্র

কিনতে চায় না। তাই এখন এই শিল্প হারিয়ে যাচ্ছে বলতে পারেন।

প্র: আপনাদের আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার জেলাতে বিভিন্ন জনজাতির মানুষের বাস তা সত্ত্বেও কেন এই শিল্প হারিয়ে যাচ্ছে বলে আপনি মনে করেন?

উ: এই অঞ্চল গুলিতে আগের মত আর পুজা-পার্বন উৎসব হয় না। আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যেও দেব-দেবী, ধর্মবিশ্বাস সম্পর্ক চিন্তা ভাবনা বদলে গেছে। এই অঞ্চলের আদিবাসী

সম্প্রদায়ের মানুষও কর্ম ব্যস্ত জীবনের সাথে তাল মিলিয়ে চলছে। এই শিল্পকে নতুন প্রজন্মের ছেলেরা পেশা করে নিতে আগ্রহী নয়।

প্র: রাজ্য সরকার কি কোনো উদ্যোগ নিয়েছে এই শিল্পকে টিকিয়ে রাখার জন্য?

উ: পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনগ্রসর কল্যাণ দপ্তর বেশ কয়েকবার উদ্যোগ নিলেও কোন লাভ হয়নি। রাভা সমাজে আজকের প্রজন্মের ছেলেরা কেউ আর এই পেশায় আসতে আগ্রহ দেখায় না।

প্র: তাহলে কি আপনার মনে হয় এই শিল্প সময়ের সাথে হারিয়ে যাচ্ছে?

উ: হ্যাঁ। এই শিল্পে যে রকম পরিশ্রম দিতে হয়, সেই তুলনায় মজুরি আসে না।

প্র: রাভা সমাজের প্রাচীন ঐতিহ্য কারুশিল্পের বিলুপ্তি মূল কারন কি?

উঃ আগে অনেক রকম অনুষ্ঠান হত। নাচ, গান, পূজা-পার্বন আমাদের সমাজে লেগেই থাকত। সেই সব অনুষ্ঠানে বাঁশের তৈরি মূর্তি, মুখোশ, বাদ্যযন্ত্রের একটা ভালো প্রভাব ছিল। কিন্তু গত কয়েক বছর ধরে নাচ গানের অনুষ্ঠান কমে যাওয়ায় কারুশিল্পের ব্যবহারও কমে গেছে।

সাক্ষাৎকার: ৪

সমারি রাভা

(মহিলা, বয়স: ৫৩, গ্রাম: ছোটবস্তি, গ্রাম পঞ্চায়েত অঞ্চল: শালকুমার ২, জেলা: আলিপুরদুয়ার)

প্র: মাসিমা আপনার নাম কি?

উ: সমারি রাভা।

প্র: আপনার এই গ্রামের নাম কি?

উ: ছোট রাভা বস্তি।

প্র: আপনার বয়স কত?

উ: তেপ্পান্ন বছর।

প্র: কতদিন ধরে এই গ্রামে আছেন?

উ: বিয়ের পর থেকে এই গ্রামে আছি।

প্র: বিয়ে হওয়ার কতদিন হল?

উ: তিরিশ বছর।

প্র: বিয়ের আগে আপনার বাড়ি কোথায় ছিল?

উ: বড়ো শালবাড়ি, তুফানগঞ্জ।

প্র: বড়ো শালবাড়িতে আপনারা কত ঘর রাভা পরিবার আছেন?

উ: আমার বিয়ের সময় চল্লিশ ঘর ছিল। এখন একশ পরিবার হবে।

প্র: আপনার এই গ্রামে কত ঘর রাভা পরিবার আছে।

উ: তিরিশ ঘর আছি।

প্র: আপনার স্বামীর নাম কি?

উ: সরেন রাভা।

প্র: আপনার স্বামীর পেশা কি?

উ: ফরেস্টে বনকর্মী পদে আছে।

প্র: আপনার ছেলে মেয়ে আছে?

উ: এক ছেলে দুই মেয়ে।

প্র: ছেলে মেয়ের পড়াশুনা কতদূর?

উ: ছেলে উচ্চ মাধ্যামিক পাস। বড় মেয়ে ক্লাস সেভেন, ছোট মেয়ে মাধ্যমিক পাস।

প্র: আপনার ছেলে এখন কি করে?

উ: সিভিক পুলিসে চাকরি করে।

প্র: ছেলের বিয়ে দিয়েছেন?

উ: হ্যাঁ।

প্র: আপনার বৌমার বাড়ি কোন গ্রামে?

উ: কালচিনির মেন্দাবারি।

প্র: কিভাবে পরিচয় হল?

উ: আমার বোনের বাড়ি ওই গ্রামে। বোনই ছেলের বিয়ের ঘটক।

প্র: বিয়েতে কি কোন যৌতুক নিয়েছেন?

উ: মেয়ের বাড়ি থেকে ছেলেকে একটা বাইক দিয়েছে।

প্র: আপনারদের সমাজে যৌতুক দেওয়ার রীতি আছে?

উ: আগে তো ছেলের বাড়ি থেকে মেয়ের বাড়িতে যৌতুক দিত।

প্র: আপনার বিয়ের সময় আপনার স্বামী কি আপনার বাড়িতে যৌতুক দিয়েছিল?

উ: হ্যাঁ। আমার বাবা কে দুই বিঘা জমি কিনে দিয়েছিল তারপর বিয়ে হয়।

প্র: এখন কি ছেলের বাড়িতে যৌতুক দিতে হয়?

উ: এই অঞ্চলে রাজবংশী জনসংখ্যার লোক বেশি আছে তাঁদের বিয়ের রীতির সাথে আমাদের রাভা সমাজের রীতি মিশে যাচ্ছে। তাই রাভা সমাজে যৌতুক দেওয়ার রীতি বদলে যাচ্ছে।

প্র: আপনার নাতি-নাতি আছে?

উ: হ্যাঁ। একজন নাতি আরেকজন নাতনি।

প্র: আপনাদের সমাজে শিশু জন্মের কতদিন পর নামকরণ করা হয়?

উ: জন্মের এক মাস থেকে দুই মাসের মধ্যে নামকরণ করা হয়।

প্র: শিশুর নামকরণ কি কোনো রীতি মেনে করা হয়?

উ: হ্যাঁ।

প্র: নামকরণের জন্য কি কি রীতি মেনে চলতে হয়?

উ: নামকরণের দিন শিশুর মামা বা দাদু কে স্নান করে নতুন ধুতি পরতে হবে। অধিকারী এসে নামকরণ করার দায়িত্ব নিবে। অধিকারী কলা গাছের বাকলে সাহায্যে একটি ডোঙা তৈরি করে জল ঢালবেন তারপর শিশুকে নিজের কোলে বসিয়ে শিশুর সম্ভাবনা নামটি উচ্চারণ করবেন। মধ্যে একটি চাল ফেলবেন চালটি যদি ভেসে উঠে নামটি পাকা করা হবে।

প্র: রাভা সমাজে শোনা যায় যে ঠাকুরদা-ঠাকুমা, দাদু-দিদার নামে নাতি-নাতনির নামকরণ করা হয়, এই রীতি কি এখন রাভা সমাজে প্রচলিত?

উ: এখন আর সেই রীতি মানা হয় না। তবে এক সময় শিশু সন্তান ছেলে হলে ঠাকুরদার বা দাদুর নামে নাম রাখা হত। ঠাকুরদা বা দাদুর মধ্যে যিনি আগে মারা যাবেন তার নামেই নাতির নামকরণ করা হবে। তেমনি শিশু কন্যা সন্তান হলে ঠাকুমা বা দিদার মধ্যে যিনি আগে মারা যাবেন তাঁর নামে নাম রাখা হত।

প্র: কি কি বারে নাম রাখা নিষিদ্ধ?

উ: শুক্রবার বা শনিবার মাসের শেষ দিন এবং পূর্ণিমা তিথির দিন ,নামকরণ অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ।

প্রঃ নামকরণের দিন কি আত্মীয়-স্বজনদেরকে আমন্ত্রণ করা হয়?

উ: হ্যাঁ। শিশুর মামার বাড়ির আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশীদের নিমন্ত্রণ করা হয়।

সাক্ষাৎকার: ৫

কান্দুরি রাভা

(মহিলা, বয়স: ৫২, গ্রাম: বড়বস্তি, গ্রাম পঞ্চায়েত অঞ্চল: শালকুমার ২, জেলা: আলিপুরদুয়ার)

প্র: আপনার নাম কি?

উ: কান্দুরি রাভা।

প্র: আপনার বাড়ি এই গ্রামে?

উ: হ্যাঁ।

প্র: এই গ্রামের নাম কি?

উ: বড় রাভা বস্তি, শালকুমারহাট।

প্র: আপনার জন্ম কি এই গ্রামে?

উ: না। এখানে বিয়ে হয়েছে।

প্র: বিয়ের আগে কোন গ্রামে বাস করতেন?

উ: দক্ষিণ কামাখ্যাগুড়ি।

প্র: দক্ষিণ কামাখ্যাগুড়িতে কত ঘর রাভা পরিবার আছে?

উ: বিয়ের আগে চল্লিশ ঘরের মত ছিলাম। এখন হয়ত বেশি আছে।

প্র: এই গ্রামে আপনার কি ভাবে বিয়ে হল?

উ: আমার দাদা এই গ্রামে বিয়ে করেছিল। দাদাই আমার এই গ্রামে বিয়ে ঠিক করে।

প্র: আপনার বয়স কত?

উ: বাহান্ন বছর।

প্র: বিয়ে হওয়ার কত বছর হল আপনার?

উ: কত হবে ঠিক মনে নেই।

প্র: আপনার স্বামীর নাম কি?

উ: কান্তেশ্বর রাভা।

প্র: আপনার পরিবারের আয় কিসের উপর?

উ: মুরগির ফার্ম আছে।

প্র: আপনারা নিজে এই মুরগির ফার্ম দিয়েছেন?

উ: হ্যাঁ।

প্র: মুরগির ফার্ম দিতে গেলে কি প্রশাসনের অনুমতি নিয়ে হয়?

উ: পঞ্চায়েত অফিস, বিডিও অফিস থেকে অনুমতি নিতে হয়।

প্র: এই ফার্ম থেকে মাসে আয় কেমন হয়?

উ: দশ-বারো হাজার টাকা আসে।

প্র: কোথায় বিক্রি করেন মুরগিগুলো?

উ: বাড়ি থেকে এসে নিয়ে যায়।

প্র: এই ফার্ম দেখাশুনা কে করে?

উ: আমার স্বামী, ছেলে।

প্র: আপনার কয় ছেলে মেয়ে?

উ: এক ছেলে।

প্র: ছেলের পড়াশুনা কতদূর?

উ: নাইন পর্যন্ত পড়েছে।

প্র: ছেলের বিয়ে হয়েছে কি?

উ: হ্যাঁ। এই এক বছর হতে দুই এক মাস বাকি আছে। বৌ গর্ভবতী আছে। প্র: তাহলে খুব ভালো খবর আপনি ঠাকুমা হচ্ছেন?

প্র: গর্ভবতী থাকাকালীন গর্ভবতী মাকে কি কি রীতি মেনে চলতে হয়?

উ: আমাদের রাভা সমাজে গর্ভবতী মাকে অনেক নিয়ম মেনে চলতে হয়। সাত মাস হয়ে গেলে স্ত্রীর সঙ্গে স্বামী মিলিত হন না। গর্ভবতী মহিলার স্বামী পশু, পাখি হত্যা করবেন না।

প্র: গর্ভবতী মহিলা কি বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পারেন?

উ: বিয়ে বাড়ি, অন্নপ্রাশন বাড়ি যেতে পারবেন। শ্রাদ্ধ বাড়িতে যেতে পারবেন না।

প্র: স্বামীকে কি কি নিয়ম মেনে চলতে হয়?

উঃ গর্ভবতী মহিলার স্বামী কবরস্থানে যাবেন না। মৃত পশু বা পাখি ধরতে পারবেন না। মই নিড়ানি নির্জন ,খুঁটার সঙ্গে বেঁধে রাখা গরু বা ছাগলের দড়ি মারাবেন না। একা একা বনে , পুকুরে বা নদীর পাড়ে যাবেন না।

প্র: গর্ভবতী মহিলা বা তাঁর স্বামী কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশ নিতে পারেন?

উ: ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যাওয়া বারন।

প্র: গর্ভবতী সময়ে কোন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় কি?

উ: হ্যাঁ। সাত-আট মাস হয়ে গেলে বাড়িতে স্বাদ খাওয়ার আয়োজন করা হয়।

প্র: স্বাদ খাওয়ার অনুষ্ঠানে কারা নিমন্ত্রিত থাকেন?

উ: গর্ভবতী মহিলার বাপের বাড়ির সবাই নিমন্ত্রিত থাকবেন। স্বাদ খাওয়ানোর দিনেই গর্ভবতী মহিলার মা জামাইয়ের বাড়িতে প্রথম পা রাখেন। পাড়া প্রতিবেশীরাও আমন্ত্রিত থাকেন।

প্র: আর কি কি নিয়ম মেনে চলতে হয়?

উ: সন্ধ্যার সময় একা একা কোথায় যেতে পারবেন না। চুল বেঁধে রাখতে হবে সব সময়।

প্র: গর্ভবতী সময়ে রান্না করতে দেওয়া হয় কি?

উ: সাত মাস হয়ে গেলে রান্না করতে দেওয়া হয় না।

প্র: গর্ভবতী মহিলার কি কি খাওয়া বারন?

উ: লাউ গাছের আগা, শামুক, ঝিনুক, খাবেন না।

প্র: গর্ভবতী মহিলারা কি পূজা-পার্বনে অংশ নিতে পারেন?

উ: ঠাকুর ঘরে যাওয়া, পুজা-পার্বনে অংশ নেওয়া বারন। কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করতে পারবেন না।

প্র: গর্ভবতী মহিলার সুস্থ সন্তান প্রসবের জন্য আপনারা কি কোন দেব-দেবীর মানত রাখেন?

উ: হ্যাঁ। স্বাদ খাওয়ার অনুষ্ঠানের সময় বাই ম'াবইদেবতার পূজা দেওয়া ' হয় যাতে স্বাভাবিক ভাবে সন্তান প্রসব হয়।

প্র: প্রসব করানোর জন্য কোথায় নিয়ে যান?

উ: গ্রামে আশাকর্মী আছে তারাই এখন হাসপাতাল নিয়ে যায়। আগে বাড়িতেই হত।

প্র: বাড়িতে কে প্রসব করাতেন?

উ: 'ধাই'।

প্র: বাড়িতে প্রসব হলে কোনো সমস্যা হত না?

উ: না। 'ধাই' ইন্দ্রজালিক অনুষ্ঠান বা তুক-তাক মন্ত্রের সাহায্যে বুঝে যান গর্ভবতী মহিলার শারীরিক সমস্যা আছে কিনা।

প্র: গর্ভবতী মহিলার প্রসবের সময় 'ধাই' কি কি উপকরণ ব্যবহার করেন?

উ: তেল, জল ভরা কলসি, গাছের পাতা, বাঁশের নলি।

প্র: প্রসবের পর 'ধাই' বন্ধনি নালি কি দিয়ে কাটেন?

উ: তীক্ষ্ণ ধার বাঁশের সূচ দিয়ে।

প্র: প্রসবের দিন জননীকে কি খেতে দেওয়া হয়?

উ: প্রসবের আগে কোন খাবার দেওয়া হয় না। তবে প্রসব হয়ে গেলে ভাত, ডাল, পেপে ভাজি দিয়ে খাওয়ার রীতি আছে।

প্র: কত দিন অশৌচ পালন করতে হয়?

উ: ত্রিশ দিন।

প্র: সন্তান জন্মানোর কত দিন পর শিশুর চুল নখ কাটা হয়?

উ: ত্রিশ দিন পর। নাপিত এনে শিশুর চুল ও নখ কাটা হয়।

প্র: অশৌচ পালনের দিন কি কোনো রকম অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়?

উ: হ্যাঁ। সেদিন পাড়া প্রতিবেশীদের নিয়ে অনুষ্ঠান করা হয়।

প্র: রাভা সমাজে 'ধাই' এর কি আজ কোনো প্রয়োজন হয়?

উ: গ্রামে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র আছে। আশাকর্মী বাড়িতে এসে গর্ভবতী মায়েদের তারাই স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যান। তাই এখন আর 'ধাই' কে কেউ ডাকে না।

প্র: এখন কি কেউ আপনাদের গ্রামে 'ধাই' এর কাজ করেন?

উ: এখন আর কেউ এই কাজে আসতে চান না।

সংগ্রহ সূত্র

- গ্রাম: ছোটবস্তি, গ্রাম পঞ্চায়েত অঞ্চল: শালকুমার ২, জেলা: আলিপুরদুয়ার, সংগ্রহের কাল: ০৪-০২-২০১৮, ০৬-০২-২০১৮

১. সমারি রাভা (মহিলা, বয়স: ৫৩, পেশা: গৃহবধূ)।

২. বিষ্ণু রাভা (পুরুষ, বয়স: ৫২, পেশা: কারুশিল্প)।

৩. গীতা রাভা (মহিলা, বয়স: ৪৮ পেশা: অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী)।

৪. কুমুদিনী রাভা (মহিলা, বয়স: ৪৮ পেশা: গৃহবধূ)।

৫. সনেকা রাভা, (মহিলা, বয়স: ৫৪, পেশা: গৃহবধূ)।

৬. যোগেশ রাভা (পুরুষ, বয়স: ২২, পেশা: দিন-মজুরি)।

৭. প্রতিমা রাভা (মহিলা, বয়স: ৪৬, পেশা: গৃহবধূ)।

৮. সরেন রাভা (পুরুষ, বয়স: ৫৫, পেশা: বনকর্মী)।

- গ্রাম: বড়বস্তি, গ্রাম পঞ্চায়েত অঞ্চল: শালকুমার ২, জেলা: আলিপুরদুয়ার, সংগ্রহের কাল: ১৮-০২-২০১৮, ১৯-০২-২০১৮

১. বিনতা রাভা (মহিলা, বয়স: ৩৪, পেশা: গৃহবধূ)।

২. কান্দুরি রাভা (মহিলা, বয়স: ৫২, পেশা: গৃহবধূ)।

৩. বিরেন রাভা (পুরুষ, বয়স: ৬৬, পেশা: কৃষিকাজ)।

৪. কল্পনা রাভা (মহিলা, বয়স: ৫২, পেশা: গৃহবধূ)।

৫. লতিকা রাভা (মহিলা, বয়স: ৫৫, ,পেশা: গৃহবধূ)।

৬. নৃপেন রাভা (পুরুষ, বয়স: ৪০, পেশা: ট্রাক্টর চালক)।

৭. কান্তেশ্বর রাভা(পুরুষ, বয়স: ৫৪, পেশা: মুরগির ফার্মের ব্যবসা)।

- গ্রাম: মুন্সী পাড়া, গ্রাম পঞ্চায়েত অঞ্চল: শালকুমার ১, জেলা: আলিপুরদুয়ার, সংগ্রহের কাল: ০৫-০৮-২০১৮।

১. ললিতা রাভা (মহিলা, বয়স: ৪৮, গৃহবধূ)।

২. রাজেন রাভা (পুরুষ, বয়স: ৪১ পেশা: বনকর্মী)।

৩. সাবিত্রী রাভা (মহিলা, বয়স: ৩২, আশা কর্মী)।

৪. রামসিং রাভা (পুরুষ, বয়স: ৫৬, পেশা: কৃষিকাজ)।

- গ্রাম: সুরিপাড়া, গ্রাম পঞ্চায়েত অঞ্চল: শালকুমার ২, জেলা: আলিপুরদুয়ার, সংগ্রহের কাল: ১৯-০৮-২০১৮, ২০-০৮-২০১৮, ২১-০৮-২০১৮,২২-০৮-২০১৮

১. ভবেশ রাভা (পুরুষ, বয়স: ৫১, পেশা: দিন-মজুরি)।

২. বিপুল রাভা (পুরুষ, বয়স: ৫১, পেশা: দিন-মজুরি)।

৩. রাজেশ রাভা (পুরুষ, বয়স: ২৫, পেশা: সিভিক পুলিশ)।

৪. বুলবুলি রাভা (মহিলা, বয়স: ৩২, আশা কর্মী)।

৫. মনি রাভা (মহিলা, বয়স: ৩২, গৃহবধূ)।

৬. ফাগুনেশ্বরী রাভা (মহিলা, বয়স: ৭৯, প্রবীণ মহিলা)।

৭. রসবালা রাভা(মহিলা, বয়স: ৫২, গৃহবধূ)।

৮. পুরনী রাভা (মহিলা, বয়স ৫২, পেশা: গৃহবধূ)

৯. সুহিনী রাভা (মহিলা, বয়স ৫৬, পেশা: গৃহবধূ)

১০ কর্নেশ্বরী রাভা(মহিলা, বয়স: ৬০,পেশা: গৃহবধূ)

১১. আমারি রাভা (মহিলা, বয়স: ৬৪, প্রবীণ মহিলা)

১২. তাপসী রাভা (মহিলা, বয়স: ৫৪, পেশা: গৃহবধূ)

১৩। মল্লিকা রাভা (মহিলা, বয়স: ৫০, পেশা: গৃহবধূ)

১৪. অনুরাধা রাভা(মহিলা, বয়স: ৫২, পেশা: গৃহবধূ)

১৫. বুধুনি রাভা (মহিলা, বয়স: ৫৬, পেশা: গৃহবধূ,)

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১. খান আইয়োব, আলী আহাম্মদ (২০০৭)। *গারো পাহাড় অঞ্চলের আদিবাসী।* ঢাকা: শোভা প্রকাশ।

২. ঘোষ, প্রদ্যোত (২০০৭)। *বাংলার জনজাতি*। কলকাতা: পুস্তক বিপণি।

৩. চক্রবর্তী, বরুণকুমার (২০১১)। *লোককথার সাতকাহন*। কলকাতা: অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স।

৪. চক্রবর্তী, বরুণকুমার (১৯৮০)। *লোক-বিশ্বাস ও লোক-সংস্কার*। কলকাতা: পুস্তক বিপণি।

৫. চক্রবর্তী, সমীর (২০১০)। *চা বলয়ের সংস্কৃতি*। কলকাতা: লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

৬. দে সরকার, দিগ্বিজয় (২০১০)। *উত্তরবঙ্গের লোকসংস্কৃতি পরিচয়*। কলকাতা: ছায়া পাবলিকেশন।

৭. দে, দিলীপকুমার (২০০৭)। *কোচবিহারের লোকসংস্কৃতি*। কলকাতা: অণিমা প্রকাশনী।

৮ দেব, রণজিৎ (২০১৪)। *উত্তরবঙ্গের উপজাতির ইতিবৃত্ত*। কলকাতা: মেইনস্ট্রীম পাবলিকেশন।

৯. দেব, রণজিৎ (২০১৫)। *উত্তরবঙ্গের পূজাব্রত উৎসব।* হাওড়া: রেনেসাঁ প্রকাশন।

১০. দাশ, যোগেশ (১৯৮৩)। *আসামের লোকসংস্কৃতি*। নয়া দিল্লি: ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট।

১১. নাথ, প্রমথ (২০১৪)। *উত্তরবঙ্গের আদিবাসী লোককথা*। কলকাতা: এন. ই. পাবলিশার্স।

১২. বর্মন, ধনেশ্বর (২০০৭)। *উত্তরবঙ্গের জনজীবন ও লোকাচার* । কলকাতা: প্রগতিশীল প্রকাশক।

১৩. বাস্কে, ধীরেন্দ্রনাথ (২০১৩)। *পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী সমাজ, প্রথম খণ্ড*। কলকাতা: বাস্কে পাবলিকেশন।

১৪. বিশ্বাস, অচিন্ত্য (২০০৮)। *লোকসংস্কৃতি ও বাংলা সাহিত্য*। কলকাতা: অঞ্জলি পাবলিশার্স।

১৫. বিশ্বাস, সুশান্ত (২০১৭)। *লুপ্তপ্রায় লোকসংস্কৃতি*। কলকাতা: লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

১৬. ভট্টাচার্য, আশুতোষ (১৯৮২)। *বাংলার লোকসংস্কৃতি*। নয়া দিল্লি: ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট।

১৭. মজুমদার, দিব্যজ্যোতি (২০১০)। *লোকসংস্কৃতির ভবিষ্যৎ ও লোকাহত মান।* কলকাতা: গাঙচিল।

১৮. মজুমদার, ব্রজগোপাল (২০১৩)। *আদিবাসী জীবনযাত্রায় ফলিত বিজ্ঞানের উন্মেষ*। ত্রিপুরা: অক্ষর পাবলিকেশানস্।

১৯. রাভা, রাজেন (১৯৭৪)। *রাভা জনজাতি*। গুয়াহাটি: বীনা লাইব্রেরি।

২০. সাহা, রেবতীমোহন (২০১০)। *রাভাদের লোককাহিনী*। কলকাতা: অঞ্জলি পাবলিশার্স।

পত্র-পত্রিকা পঞ্জি

১. ঘোষ, দীপঙ্কর (সম্পাদিত) (২০০১)। *বাংলা সাময়িকপত্রে আদিবাসী কথা*। কলকাতা: লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

২. দে সরকার, দিগ্বিজয় (সম্পাদিত) (২০০৩)। *উত্তরবঙ্গের লোকসংস্কৃতি*। কলকাতা: পত্রলেখা।

৩. *দার্জিলিং মেল,* ১৮ই জানুয়ারি ২০১৮। দার্জিলিং।

৪. রায়, সুপ্রিয়া (সম্পাদিত) (২০০৬)। *কোচবিহার জেলা সংখ্যা*। কলকাতা: তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

৫. বসু, আশিসকুমার ও চ্যাটার্জী, দেবী (সম্পাদিত) (২০০৪)। *অন্তেবাসী সমাজ, সংস্কৃতি ও উন্নয়ন*। হাওড়া: ম্যানাস্ক্রিপ্ট ইণ্ডিয়া।

৬. রায় দত্ত, বেণু (সম্পাদিত) (২০০২)। *উত্তর বাংলার লোকসংগীত*। কলকাতা: সাহিত্য অকাদেমি।

৭. সরকার, প্রণব (সম্পাদিত) (২০১৮)। *স্বদেশচর্চা লোক গোষ্ঠী, সমাজ, সম্প্রদায়-১*। কলকাতা: লোক প্রকাশন।

৮. সরকার, প্রণব (সম্পাদিত) (২০১৯)। *স্বদেশচর্চা লোক গোষ্ঠী, সমাজ, সম্প্রদায়-২*। কলকাতা: লোক প্রকাশন।

৯. শেখ, মকবুল ইসলাম (সম্পাদিত) (২০১১)। *উত্তর বাংলার জীবন ও সংস্কৃতি*। কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ।

১০. সমাদ্দার, শেখর (সম্পাদিত) (২০১৯)। *আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় গবেষকদের সেমিনার উপস্থাপনা পত্র সংকলন*। কলকাতা: বাংলা বিভাগ এবং রবীন্দ্রনাথ স্টাডিজ সেন্টার, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়।

১১. সাহা, সঞ্জয় (সম্পাদিত) (২০০৮)। *তিতির*। কলকাতা: অক্ষর বিন্যাস।

ইংরেজি গ্রন্থ

1. Das, Jogesh (1992). *Folklore of Assam*. New Delhi: National Book Trust.

2. Sanyal, Charu Chandra (1965). *The Rajbansis of North Bengal*, Kolkata: The Asiatic Society.

বৈদ্যুতিন উৎস

1. http://alipurduar.gov.in

2. www.censusindia.gov.in